উৎসর্গ

মঝঃফরপুর কলেজের অধ্যাপক সুসাহিত্যিক

ডক্টর হরিরঞ্জন ঘোষাল প্রিয়বরেষু

ব. ভ. ম.

এই লেখকের—

রাণুর প্রথমভাগ
রাণুর দ্বিতীয়ভাগ
রাণুর তৃতীয়ভাগ
রাণুর কথামালা
বর্ষায়
বসন্তে
শারদীয়া
হৈমন্তী
বরযাত্রী
স্বর্গাদপি গরীয়সী
নীলাঙ্গুরীয়
বাসর
দৈনন্দিন
ইত্যাদি

সমাধান

খগেন হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, বলিল—"সর্বনাশ হয়েছে হাবুলদা, গোবরার ডবল নিউমোনিয়া!"

হাবুল চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল—"সে কি! কাল রাত বারোটা পর্যন্ত খেটেছে, কিছু তো ছিল না!"

"ছিল—জ্বর, আমি জানতাম। তোমায় জানাতে দিব্যি দিয়ে দিলে ফট করে। আমিও কি জানি একেবারে নিউমোনিয়ায় দাঁড়াবে! তবু ক'বার বললাম—যা গোবরা বাড়ি যা, মরবি! শুনলেই না…"

হাবুল চা-য়ে তাড়াতাড়ি দুইটা চুমুক দিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল—"দাঁড়া আসছি গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে।"

"কোথায় যাবে?"

"গজুকে সঙ্গে নিয়ে যাই বুড়ির ওখানে; চিকিৎসা করাতে হবে তো, না, তোর মতন আতালিপাতালি করে বেড়ালেই চলবে?"

"কোন ফল নেই গিয়ে, তবে আর বলছি কেন?—বুড়ি ঢুকতে দেবে না কাউকে।…দোরের কাছে বঁটি রেখে ঘরে খিল দিয়ে 'বাবা পঞ্চানন, বাবা পঞ্চানন' বলে চেঁচাচ্ছে…একেবারে পাগল হয়ে গেছে মাগি…"

হাবুল আবার ধীরে ধীরে উপবেশন করিল, বলিল—"বোস্, তুইও কম পাগল হোসনি খগেন, এই রকম নার্ভ নিয়ে তোরা দেশের আর দশের কাজ

করবি ?…কি হয়েছে মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেঙে বল্ দিকিন।…চা খেয়ে বেরিয়েছিলি ?”

খগেন সামনে শানের রকটার উপর বসিয়া বলিল—“না, আনতে বলুন।… জ্বর নিয়ে বাড়ি গেল, সমস্ত রাত মনটা খারাপ হয়ে ছিল। ভোরে উঠেই ভাবলাম আগে ছোঁড়াটাকে দেখে আসি। গিয়ে দেখি ঘরে ওর দিদিমা-বুড়ি নেই, গোবরা বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা পুড়ে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে বুকের ঘড়ঘড়ানি। জিজ্ঞেস করলাম দিদিমা কোথায় তোর ?—বললে পঞ্চানন তলায়, একটু জল দে, মরে যাচ্ছি।…কলসী থেকে জল গড়িয়ে কয়েক ঘোঁট খাইয়ে আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। গজেনদাকে একরকম ঘুম থেকে টেনে তুলে নিয়ে গেলাম। বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়েই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। বাইরে এসে বললেন, নিউমোনিয়া খগেন, দুটো সাইডেই ধরেছে ; ওষুধ আমি দিচ্ছি, কিন্তু পেনিসিলিনটা হলে ভালো হোত।…যখন আমরা ওষুধ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছি, ওদিক থেকে বুড়িও এসে গেছে। একে ক'দিন থেকে আমাদের ওপর চটেই ছিল, দোরগোড়া থেকে সাড়া পেয়ে একেবারে মারমুখো হয়ে বেরিয়ে এল—বেরোও, বেরোও এখান থেকে—ওষুধ !—ড্যাক্তারি ! বাবার কাছে ঘাট করিয়ে অসুখ করিয়ে দরদ দেখাবার এয়েচে !…বেরোও, নৈলে আঁশবটি বের করব। সাধ মেটেনি…এর ওপর ড্যাক্তারি করে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করবে !…আমি বাবার চন্নামৃত এনে দিয়েচি, আমার গোবরার ঘাট হয়েচে কয়ে ধন্না দোব বাবার কাছে, এর মধ্যি কেরেস্তানি আনবে কেডা একবার দেখব আমি !…”

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল—“পাড়া-পড়শিরা বোঝালে না ?”

“আদ্দেক পাড়া-পড়শি তো ওর দিকেই হাবুলদা, আদ্দেক—যারা আমাদের সঙ্গে কাল ছিল তারাও গোবরার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছে। অনেকে তো ঘর ছেড়ে বেরুলই না, যারা বেরুল তারা আমাদের সরে আসতেই পরামর্শ দিলে, বললে—বাবা পঞ্চানন চটে বুড়ির ওপর ভর করেছেন—এর ঝোঁকে যদি

বসিয়েই দেয় একটা কোপ বুড়ি তো কারুর বলবার কিছু থাকবে না। আমি বলি, বাবা পঞ্চানন আমাদের ঘাড়েই ভর করবার চেষ্টা করুন না হাবুলদা, দোষ যদি হয়ে থাকে সে তো আমাদেরই?"

হাবুল একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, ভিতরে ভিতরে একটা চিন্তার স্রোত বহিতেছিল তাহার, উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"বোস্ তুই, আমি আসছি, হচ্ছে ব্যবস্থা, গোবরাকে বাঁচাতেই হবে।"

একটু পরে বাহির হইয়া আসিয়া চারিখানা দশটাকার নোট খগেনের হাতে দিয়া বলিল—"আর একেবারে সময় নেই, খুলনার বাসটা এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে; তুই ছুটে গিয়ে গজুকে একবার জিজ্ঞেস করে নে কত পেনিসিলিন লাগবে, তারপর দৌড়ে গিয়ে বাস ড্রাইভারকে আমার নাম করে বলে দে যেন গিয়েই পেনিসিলিনটা কিনে ফেরৎ বাসে ফ্লাস্কে ভরে পাঠিয়ে দেয়—গজুর কাছ থেকে তার বড় ফ্লাস্কটা নিয়ে নিবি। ফিরে ঐখানেই আসবি আবার, আমিও ওখানেই যাচ্ছি, গজুকে নিয়ে গোবরাকে দেখতে যাব।"

২

বাবা পঞ্চাননের চটিবার ইতিহাসটা এই—

চারিদিকে অস্পৃশ্যতা বর্জনের হাওয়া উঠিয়াছে। পরাধীন জাত মুক্তি-সাধনায় নামিয়া বুঝিল কেন সে জগতে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, কোথায় অস্পৃশ্যতার বেদনা—দুই বাহু দিয়া যাহাদের এতদিন দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, দুই বাহুর বন্ধনে তাহাদের বুকে টানিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সর্বজনীন পঙ্‌ক্তিভোজন চলিল গ্রামে গ্রামে—শূদ্রের রন্ধন, শূদ্রের পরিবেষণ—শূদ্রের মধ্যেও আবার যাদের সবচেয়ে নিচে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল; প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে আর এতটুকু খুঁৎ রাখিতে চাহিল না কেহ; বাংলা আবার একবার চৈতন্যদেবের মন্ত্রে সচেতন হইয়া উঠিল। পাপ তো শুধু এইটুকুই ছিল না, আরও যা বড় পাপ—ভগবানকে তাঁহার ভক্ত থেকে বঞ্চিত করিয়া

রাখিয়াছিল, আজ আবার মন্দিরদ্বার খুলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিল তাঁহার কাছে। এই আনন্দের উন্মাদনা গ্রামের পর গ্রাম ছাইয়া ফেলিল।

এই গ্রামেও উঠিল সাড়া। গ্রামের যুবাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল। তাহাদের পরিচালক হাবুল, সব কাজেই অগ্রণী, আর গজেন, নূতন পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের চেষ্টায় বড়দেরও অনেকে আসিয়া পড়িতে লাগিল, দিন দিনই পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তাহাদের দল। কিছু যে রহিল না বিপক্ষে এমন নয়,—তাহারা জীর্ণ আয়ু আর জীর্ণ অভিমত লইয়া একদিকে তাহাদের নিজের আসর সরগরম করিয়া তুলিল।

উহাদের ছাড়া যায়, কিন্তু যাহাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনের ব্যবস্থা তাহাদের লইয়াই গোল বাধিল। মাচাতেই যে সব লতার স্থান, নিচে ফেলিয়া রাখিলে তাহারা মাটিতে শিকড় নামাইয়া দেয়; তখন তাহাদের টানিয়া তোলা শক্ত, অনেক লতা ছিঁড়িয়া যায় কিন্তু মাটি ছাড়িয়া উঠিতে চায় না। তাহাদের অবস্থাও সেই রকম হইয়া গিয়াছে—যুগযুগের অবমাননায়। অবমাননাকেই তাহারা প্রাণের উপজীব্য করিয়া লইয়াছে; দেবতা হারাইয়া, মানুষ হারাইয়া তাহারা না চেনে দেবতার প্রকৃত রূপ, না করে মানুষকে বিশ্বাস।...গ্রামের মাঝখানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের বাস, কতকটা চারিদিকের হাওয়ার প্রভাবে আর হাবুল-গজেন প্রমুখ যুবকদের প্রাণপাত চেষ্টায় তাহারা অনেকেই আগাইয়া আসিল, নিতান্ত অল্প-কিছুই রহিল বিপক্ষে; কিন্তু গ্রামের চারিদিক ঘিরিয়া যে "অন্তেবাসী"র দল—ওদিকে নমশূদ্র, এদিকে হাড়ি, মুচি, তাহারা সকলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল—বামনের পাতে রাঁধা অন্ন দিবে! মন্দিরের চৌকাঠ মাড়াইবে!...একে তো কত জন্মের পাপে এই অবস্থা—মানুষ হইয়াও মানুষ নয়...

অনেক বুঝাইতে হইল, নিজের দেশে উদারতার নজির খুব অল্প। কবে রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে ঐ একটি—কবে চৈতন্যদেব শিষ্য করিয়াছিলেন যবন হরিদাসকে—এ নজিরও দেখাইল

তাহারা, তবে চালোয়া নজির আনিতে হইল বিদেশ হইতে—যেথায় এ পাপাচরণ নাই—'দেখো না গো, তোমাদের যারা হুকুম করছে—শুনেছ কি অমুক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অমুক সাহেব বামন, ওমুক সিবিল সার্জনটা হাড়ি··· যে যেমন কাজ পেয়েছে খোলা প্রাণে লেগে গেছে···কলকাতায় যাও না, বড় বড় সব পাথরের মূর্তি দেখবে, কারুর বাপ চামারের কাজ করত, ছেলে সুবিধে পেয়ে তোমাদের দেশের ব্রাহ্মণকেও গেল টপকে। ওরা কাজকে বলে লক্ষ্মী—চামড়ারই হোক, মাছেরই হোক, ইস্কুল-পাঠশালারই হোক, আর ঠাকুরঘরেরই হোক···তা লক্ষ্মীর জাত আছে ?···বলো না গো তোমরা···'

অনেক চেষ্টা করিতে হইল, অনেক সময় লাগিল, শেষকালে কিছু কিছু পাওয়া গেল সাড়া।

তাহার মধ্যে যশোদা-বুড়ির নাতি গোবরা একেবারে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল কাজের মধ্যে। ছেলেটার বয়স সতর আঠার, বোধ হয় চেহারাটা সাধারণ ভদ্রলোকের ছেলের চেয়েও ঢের সুন্দর বলিয়া, তাহার উপর খেলাধূলায় বেশ চটপটে বলিয়া সে গোড়া হইতেই কি করিয়া ভদ্র সমাজে খানিকটা মিশিয়া গিয়াছিল। আর, মিশিয়া গিয়াছিল বলিয়াই সে বাধাবিঘ্নগুলি ভাল করিয়া চিনিত এবং তাহার কাঁটাগুলি তাহাকে বিঁধিত বেশি করিয়া। তাহার পুরান সঙ্গী খগেন যেদিন তাহার আধ-খাওয়া পেয়ারাটা লইয়া গপ করিয়া মুখে পুরিয়া দিল, সে হতভম্ব হইয়া একটু চাহিয়া রহিল বটে, তবে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল না। খগেন হাসিয়া বলিল—"কেষ্ট-ঠাকুর এই রকম করে কেড়ে খেত রে, শুনিসনি ?"

গোবরা একটু হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটু অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল—"কিন্তু ফিরিয়েও দিত খানিকটা, সবটা মেরে দিতুনি তোর মতন।"

খগেন একটা টুকরা বাহির করিয়া কাপড়ে মুছিয়া বলিল—"নে।"

তারপর তাহার প্ল্যানটা বলিল—পঙ্‌ক্তিভোজনের, মন্দিরপ্রবেশের—তাই

থেকে জাতির দুর্দশার কথা···তোদের সঙ্গে পেলে আমরা কী না করতে পারি গোবরা ?···

কাঁটাগুলি গোবরার বিঁধিত মাঝে মাঝে, স্বস্তি অনুভব করিল; মিশিয়া মিশিয়া তাহার কুণ্ঠা অনেকটা মিলাইয়াই আসিয়াছিল; যখন ডাক পড়িল তখন বেশ নিঃসঙ্কোচেই নিজের অধিকারে গিয়া মাঝখানটিতে দাঁড়াইল; পঙ্‌ক্তিভোজনের জোগাড়যন্ত্রে একেবারে মনপ্রাণ দিয়া মাতিয়া উঠিল।

সবল শরীর, ঝোঁকটা পড়িলও তাহার উপর বেশি। অতবড একটা ভোজের চালডাল প্রভৃতি সংগ্রহে বাহিরে পর্যন্ত যাইতে হইল অনেকবার; বর্ষাকাল, ভিজিতে হইল। কাজের আগের দিনই শরীরটা খারাপ হইল।

কিন্তু এ আনন্দ-উৎসবের জন্য জীবনকেও পণ করা যায়, সামান্য একটু অসুখকে আমল দিল না গোবরা। আবার খাটিল, আবার ভিজিল, রাঁধিল, পরিবেষণ করিল, মন্দিরে গিয়া পঞ্চাননের মাথায় জীবনে প্রথমবার নিজের হাতে ফুল-বিল্বপত্র ঢালিয়া দিল।

তাবপর এক খগেন ভিন্ন সবার চক্ষু এডাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা গ্রহণ করিল।

বাবা পঞ্চাননের চটিবার ইতিহাসটা এই।

৩

একটু পরেই খগেন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে গজেন ডাক্তারের ওখানে ফিরিল। ওষুধপত্র লইয়া তিনজন আবার যশোদা-বুড়ির বাড়ির দিকে যাত্রা করিল। ঠিক হইল—প্রয়োজন হয় তো বলপ্রয়োগও করিতে হইবে। গজেন থাকিবে পিছনে, একটু আড়ালে, এরা দুজন গিয়া দরজা খুলাইয়া প্রবেশ করিবে, তার পর ভালো কথায় বোঝে তো গজেনকে ডাকিয়া লইবে, নয়তো বুড়িকে পাঁজায় করিয়া অন্যঘরে বন্ধ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। মোটকথা গোবরাকে বাঁচাইতেই হইবে।

খানিকটা দূর হইতেই বুড়ির গলা শোনা গেল—“দোহাই বাবা পঞ্চানন, গোবরার কিছু অপরাধ নেই—যারা জো-সাজোস করে ওকে দে তোমার মাথায় জল ঢাল্যেচে তাদের ওলাওঠা ধরাও রাতারাতি—আমার গোবরা কিছু জানে না—তুমি এ পোড়া গেরাম জালিয়ে দেও—গোবরাকে আমার বাঁচাও…”

তিন জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল, তারপর গজেনকে একটু আড়ালে ছাড়িয়া উহারা দুই জনে আগাইয়া গেল।

উঠানের দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ। ঘরের দরজাও বন্ধ করিয়া বুড়ি রোগীর পাশে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। মেটে ঘর, দেয়ালে একটা ছোট জানালা, খানিকটা উঁচুতে, ডিঙি মারিয়া দেখা যায় না।

বাহিরে অনেকগুলি মানুষও জড়ো হইয়াছে। বুড়ি দুই জনের উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট হইল বলিয়া মনে হইল না। হাবুল জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কয়েকটা হাঁক দিল, কানে গেল কিনা বোঝা গেল না; কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না, বুড়ি সমানে নিজের নাতির কল্যাণ ও বাকি সকলের ওলাউঠা কামনা করিয়া যাইতেছে।

গোবরা আছে কেমন বোঝা যাইতেছে না। হাবুল বিমূঢ়ভাবে মাথার চুলটা খামচাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর খগেনকে বলিল—“আয় দিকিন।”

জানালার নিচে গিয়া দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া বলিল—“ওঠ আমার কাঁধে, ডাক বুড়িকে, গোবরাও কি করছে দেখে নিস।”

একজন সবল মাঝবয়সী লোক ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আগাইয়া আসিল, বলিল—“আপনি সরেন দাদাঠাউর, খগেন ঠাউর আমার কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়ান। তারপর চান করে নিলেই হবেন।”

এই লোকটাও কাল রন্ধন-পরিবেষণে খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিল, গোবরার অবস্থা দেখিয়া আজ জাত মারিবার সাহস হারাইয়াছে।

খগেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া ডাক দিল—“ও যশোদা! যশোদা গো!”

আওয়াজটা থামিয়া গেল। "কে ডাকে ?"—বলিয়া যশোদা জানালার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল, তারপর চোখ দুইটা হঠাৎ উগ্র করিয়া এমন ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল যে খগেন একটা লাফ মারিয়া পাশের কচু বনে পড়িল।

বুড়ি আসিয়া জানলা ধরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কে ? কি কইচে ?"

হাবুল বলিল—"দোরটা একবার খোল, দেখি গোবরাটাকে একটু। ডাক্তার নেই, দেখো না, আর ডাক্তারের দরকারই বা কি—বাবাকে ডাকছ তিনিই ভালো করে দেবেন ; শুধু দেখব একবার আমরা..."

"এই খুলি"—বলিয়া বুড়ি জানালা হইতে সরিয়া গেল ; তাহারা দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় জানালার পথেই আওয়াজ আসিল—"কৈ, কোথায় গেল সব ?"

তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে, বলিল—"খুলব, কিন্তু এই দেখে থোও..."

জানালার মধ্যে দিয়া একটা বঁটির সমস্ত ফলকটা বাহির হইয়া আসিল। বুড়ি আবার গলা ছাড়িয়া দিল—"এসব, এস্‌চি, দাঁড়াও সব...কিন্তু এই আঁশবটি নিয়ে এস্‌ব...আর বামুনের খাতির কিগা—জাত আছে তার ?... দাঁড়াও এসচি—গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো..."

বাহিরে যে যেদিকে পারিল হুড়হুড় করিয়া ছুট দিল।

ভিড়টা সঙ্গে সঙ্গে পাৎলা হইয়া গেল, উহারই মধ্যে কয়েকজন বয়স্থগোছের আগাইয়া আসিয়া জানালার দিকে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—"না, তোমায় কষ্ট করে আসতে হবে না বাবা, তুমি এগলে থাকো ছোঁড়াটাকে, বুড়ির ঐ একটি অন্ধের নড়ি এগলে থাকো তুমি কিরূপে করে..."

হাবুল চটিয়া উঠিল, বলিল—"কোথায় সব সামলাবে, না, আরও উসকে দিচ্ছ ? ছেলেটা মরতে বসেছে ওদিকে—ওর চীৎকারেই যে তার আদ্দেক দম বেরিয়ে যাচ্ছে...কোথায় বুঝিয়ে বলবে, না..."

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—"কাকে বুঝিয়ে বলবো দাদাঠাউর—মানুষ হয় তবে তো···তিরশূলের ঘটাটা একবার দেখলেনি বাবার? পায়ের



"এস্‌ব, এস্‌চি, দাঁড়াও সব···কিন্তু এই আঁশবটি নিয়ে এস্‌ব·

নোক থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভর করে ফেলেচে, বাকি রেখেচে কোনখানডা ? ...আর ঘাঁটিওনি—আখেরে সারা গেরামটার ওপর দিষ্টি পড়বে বাবার...”

৪

অবস্থা যখন এতই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হাবুলের হঠাৎ নিবারণ দাসের কথা মনে পড়িয়া গেল।

নিবারণ এদের মোড়ল। বয়স হইয়াছে, বাড়ি ছাড়িয়া কম বাহির হয় আজকাল। লোকটা কিন্তু সত্যই মোড়ল হইবার উপযোগ্য। শুধু নিজেদের জাতের মধ্যেই নয়, সমস্ত গ্রামটার মাথায় যদি তাহাকে বসাইয়া দেওয়া যায় তো বেমানান হয় না। বয়সকালে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া জগৎটাকে দেখিয়াছে বলিয়া মনটা বেশ প্রশস্ত। একটু নেশাভাঙ করে, নিজে বাহির হয় নাই, নয়তো কালকের ব্যাপারটায় তাহার সম্পূর্ণ মত ছিল। সলাপরামর্শও দিয়াছে অনেক।

নিবারণের সবচেয়ে বড় গুণ—খুব অল্প কথায় নিতান্ত সহজভাবে বড় বড় সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারে। গ্রামের বড বড় মাতব্বরেও নিবারণকে ডাকিয়া পরামর্শটা-আসটা নেয়।

হাবুল তাহাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া নিবারণের দাওয়ায় গিয়া উঠিল, বলিল—“এই যে মোড়ল—ছেলেটা কি মরবে ?—গ্রামের একটা ছেলের মতন ছেলে...তোমায় উঠতে হচ্ছে একবার।”

নিবারণ অল্প অল্প ঝিমাইতেছিল, সেই ভাবেই সব কথা শুনিয়া বলিল—“আমায় এতক্ষণ বলেনি কেন সব ? আর মোড়ল!—একটা ঠাটু বসিয়ে রেখেচে।”

একটু কি ভাবিল চুপ করিয়া বসিয়া, তারপর মুখে একটু হাসি ফুটিল,

বলিল—"চলো। অন্য ঘর হলে হুকুম করে চালিয়ে দিতুম ; ও মাগি আবার সম্বন্ধে কাকি হয় কিনা—তার ওপর চিরকেলে দজ্জাল, কখনও মানেনি, মানবেও না।···তা চলো···দেখি···"

পৌঁছিয়া আবার একজনকে জানালার উপর উঠাইয়া বুড়িকে ডাকাইয়া আনিল, বুড়ি এবার বঁটিখানা হাতে করিয়াই উঠিল, নিবারণকে দেখিয়া বলিল—"কি, মুড়ুলি করতে এয়েচে ?"

নিবারণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"মোড়ল বলে মেনেচিস তুই কখনও কাকি, যে আজ মানবি ? দোরটা খোল, তোর চেল্লানির মধ্যে ছেলেটা আর কতক্ষণ টেঁকবে একবার দেখতে হবে নি ? তার ব্যবস্থা করতে হবে তো ? তাই এনু। না হয় বঁটি নিয়েই দোর খোল, কথার খেলাপ দেখিস, কোপ বসিয়ে দিস্।···দোরডা খোল আগে।"

"কিন্তু ওষুধ খাবেনি ও। বাবার চন্নামৃত দিইচি।"

"ওষুধ দিচ্ছে কে ওকে যে খাবে ? দোর খোল তুই, নয়তো ভাঙতে হবে।"

যশোদা খালি হাতেই আসিয়া কবাট খুলিয়া দিল। হাবুল, খগেন আর নিবারণ গিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল।

গোবরা নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে। হাবুল আগাইয়া নাড়ি ধরিতে যাইতেছিল, নিবারণ তাহাকে বারণ করিয়া বুড়িকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন, আগেকার চেয়ে ভালো দেখছিস, না সঙিন—মড়া খুড়োর শপথ রইল, সতী হোস তো ঠিক করে বলবি···"

এতক্ষণ শুধু রোখের মাথায় চীৎকার করিয়া গিয়াছে, এদিকে ততটা লক্ষ্য করে নাই, বুড়ি নিঝুম রোগীর দিকে চাহিয়া বলিল—"বাছা যে নেত্যে পড়েছে গো আমার···ও নিবারণ!···"

"তা পড়বেডা না কেন বল আমায়। তুই এর আগে বাবা পঞ্চাননকে

ডেকে রোগী চাঙ্গা করিসনি ?—অথচ আজও তো ডাকছিস—তাও চেল্লায়ে চেল্লায়ে—সাত পাড়ার লোকের কানে ঝালাপালা ধরে গেল, বুড়ো সাড়া দেয় না কেন—ভাবে দেখতি হবে না সেডা ?”

বুড়ি বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল, একটু পরে বলিল—“ভালো করিনি আর বাবার কাছে ধন্না দিয়ে ? —রাসুর বৌয়ের সুতিকে—ধরণীর মার শূল ব্যথা—পেসাদির পোলার পেট-জোড়া পিলে···ভালো আর করি নি ?···তবে আজ বাবা কেন···”

“বাবা আচে কোথায় আগে সেটা দেখ ভেবে ; গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্চিস যে···”

বুড়ি আরও বিহ্বল হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিবারণ বলিল—“বলি গোডা কেটে আগায় জল দেওয়া হচ্চি যে—তার হিসেব রাখিস ?···ঐ ছোঁড়া—এখন কেমন মুখ গুঁজড়ে পড়েচে—পাঁচ ভূতের পাল্লায় পড়ে বাবার মাথায় যে ফুল-বিল্বিপত্র চড়ালে বড় বড় পা ফেলে গিয়ে, তানার জাত মেরে দিলে না ?—বলি জাত গেল না তানার ?”

বুড়ির দৃষ্টি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিবারণ বলিয়া চলিল—“তানাকে আবার গঙ্গাচান করে, গঙ্গামাটি মেখে সুদ্দু হতি হবে না ? তা মা-গঙ্গা এখেনে ?—গিছলি তো সেবারে চান করতে—কোমরের ব্যথা মরতি কদিন নেগেছিল তা সরণ আচে ?···ডেকে তো যাচ্চিস বাবাকে গলা ফাটিয়ে···”

বুড়ির দৃষ্টিতে এতক্ষণে ভয়ের আভাস ফুটিল, প্রশ্ন করিল—“তা হলি ?·· য্যাতক্ষণ না সুদ্দু হয়ে ফিরতেছে তিনি ?··”

“ত্যাতক্ষণ একটা ডাগদর-বদ্যি ডেকে ঠেকাঠুকি দিয়ে রাখ্।···ছোঁড়াটাকে ধরে তো রাখতি হবে ?—চান করে ফিরে বুড়ো যদি দেখে অক্কা মেরে গেছে তো বাঁচাবে কেডাকে ?—তা বুঝিয়ে বল আমায়···”

বুড়ি একবার বিছানার পানে চাহিয়া আরও ভীতভাবে প্রশ্ন করিল—“তাহলি ?…”

নিবারণ হাবুলের দিকে চাহিয়া একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতেই বলিল—“কিগো বাবুরা, কেঁচিয়ে তো দিয়েচ মামলা, এখন বুড়ো সুদ্যু হয়ে জাতে উঠে না ফেরা পজ্জন্ত রাখো ছোঁড়াটাকে একটু টেনেটুনে। কৈ, তোমাদের সেই নতুন ডাগদর কোথায়—হরনাথ ঠাকুরের পোলা—মড়া-ঘাঁটা হাতে জাত মারতে তো সব থেকে এগিয়ে ছেল, এখন তানাব টিকি দেখি নে কেন ?…”

দেবতা

বিনোদ আসিয়া শুনিল এখানেও নাকি গান্ধী-মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ভক্তটি রমণী চাটুজ্যে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ বড় করিয়া প্ল্যান করা হইয়াছে,—মন্দির, তাহার সামনে একটা পুকুর—মাছ থাকিবে না, কেননা পাহারার ব্যবস্থা করিয়া মানুষের হিংসা নিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু মাছরাঙা পানকৌটিরা ছাড়িবে কেন?—একদিকে থাকিবে চরখা-তাঁতশালা, একদিকে ছাগলঘর—ভোগের পায়সের ব্যবস্থার জন্য। খুব একটা বড় যজ্ঞ করিয়া গান্ধীজীর মূর্তি স্থাপনা হইবে। প্রথমে স্থির হইয়াছিল জয়পুর থেকে শ্বেতপাথরের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া আনানো হইবে, কিন্তু গান্ধীজী অমন মূল্যবান আধারে আবির্ভাব হইতে চাহিবেন কি না সন্দেহ হওয়ায় কৃষ্ণনগরে মাটির মূর্তির ফরমায়েস করা হইয়াছে।

রমণী চাটুজ্যে চোরাবাজারে অসম্ভব রকম টাকা অর্জন করিয়া এখন নানাপ্রকার ভালো কাজে কিছু ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন; এইটি তার প্রথম।

বিনোদ গিয়া গদিতে উপস্থিত হইল। দেখে একটি বেশ ছোটখাট জমায়েৎ। গদির তাকিয়ায় ঠেস দিয়া রমণী বসিয়া আছেন, গায়ে একটি খদ্দরের ফতুয়া, হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের একখানি কাপড় পরা, সামনে খানতিনেক পাঁজি লইয়া পুরুত নিবারণ ভট্টাচার্যি। ইহাদের ঘিরিয়া নবীন হাজরা, শঙ্কর পাল, কেষ্ট মজুমদার, সারদা বিশ্বাস, আরও অনেকে—কাহারও ইটের পাঁজা, কেউ চুণ সুরখির কারবারী, কাহারও সিমেণ্টের চোরা গুদাম আছে, কাহারও লোহালক্কড়; একটা বড় কাজ হইবে, মালপত্র গছাইবার জন্য ঘিরিয়া ঘুরিয়া বসিয়াছে—জোঁকের গায়ে জোঁক বসিবে আর কি। বোধ হয় দিনক্ষণ লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, বিনোদ গিয়া উপস্থিত হইল।

ছেলেটি যে ইহাদের নয়নের মণি নয় সেটা সবার মুখের ভাবেই গেল বোঝা। শহরের যতরকম হ্যাঙ্গাম, বিশেষ করিয়া বড় বড় ব্যবসায়ীদের লইয়া, সবার মূলে বিনোদ; চোরাবাজারের একটা মস্তবড় প্রতিবন্ধক, এই কিছুদিন আগে কলের কুলি-মজুরদের মধ্যে একটা অশান্তি ঘটাইয়া মেদিনীপুরের দিকে একটা রিলিফের কাজে গিয়াছিল, শহরটা ছিল নিরুপদ্রব; আবার আসিয়াছে।

কিন্তু চটাইতে সাহস করে না কেহ। তাড়াতাড়ি মুখের ভাবটা সহজ করিয়া লইয়া—বরং যথাসম্ভব প্রসন্ন করিয়া লইয়াই সকলে ডাকিয়া লইল—

"এসোহে—আমাদের বিনোদ যে!···কোথায় ছিলে এত দিন?···"

"এই তো সেদিন কাকে যেন বলছিলাম—আমাদের বিনোদকে আর দেখছি না যে···এসো, বোস···"

বিনোদ গিয়া বসিল। বলিল—"গিয়েছিলাম মেদিনীপুর, জানেনই তো অবস্থা ওদিকে। ইয়ে···একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম, বিশ্বাস হোল না; তাই এলাম ছুটে,—চাটুজ্যে মশায় নাকি গান্ধীজীর মন্দির করাচ্ছেন একটা?"

চাটুজ্যে মশাই-ই উত্তর দিলেন কথাটার; সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"শোন গো তোমরা, বিনোদ ভায়ার অদ্ভুত লেগেছে কথাটা!···আমরা তো আর আধুনিক নই ভায়া, দেবদ্বিজে একটু থাকবেই ভক্তি। আমরা তুলছি, তুমি নয় ভেঙে দিও তোমার কিষাণ-মজুরের দল দিয়ে।"

—শেষের খোঁচাটুকু দিয়া আবার সবার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

বিনোদ বলিল—"ভেঙে দেবার কথা নয় দাদামশাই, যাঁর মন্দির করছেন তিনি তো দেবতাও নয়, দ্বিজও নয়।"

গদির ওপর একটা বড় ছবি টাঙানো গান্ধীজীর, সেই দিকে করজোড়ে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাটুজ্যে মশাই বলিলেন—"আমরা তো তাই বলেই জানি।"

পুরুত মশাই বলিলেন—"অতবড় একজন মহাপুরুষ…"

বিনোদ বলিল—"সে তো হাজারবার স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে এরকম পুষ্পচন্দন ভোগ দিয়ে পুজোর ব্যবস্থা কেন? এতে উনি নিজেও ব্যথা পান। জানেন তো বেহারের কোথায় এই রকম এক মন্দির করেছে বলে উনি প্রবল আপত্তি করেন। আমরা সামান্য লোক, বুঝি না, কিন্তু মহাপুরুষ বলেই উনি তো বোঝেন যে, এর দ্বারা ওঁরই উপাস্য ভগবানকে আমরা আড়াল করে ফেলি।"

কেষ্ট মজুমদার একটু তির্যক হাসিয়া বলিলেন—"ওঁদের বলতে হয় ওঁরা বলেন, তাই বলে যাঁর ভক্তি আছে তিনি কি ছাড়বেন তাঁর ভক্তি দেখাতে? কতবড় একটা কাজ করছেন চাটুজ্যে মশাই!"

চাটুজ্যে মশাই একটু বিনয় সহকারে হাসিয়া বলিলেন—"বড কাজ আর কি?—আর আমার ভক্তিই বা কতো?—তবে ধর্মটা নাকি একেবারে যেতে বসেছে…"

একটা দোষ, নিজের মেজাজটা সব সময় ঠিক রাখিতে পারে না বিনোদ, একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিল—"তার যাওয়াটা এগিয়ে দিচ্ছেন চাটুজ্যে মশাই, আমি এলাম সেই কথাই বলতে; যথেষ্ট তো দেবতা আছেন, আর মানুষ টেনে তুলে ভিড় বাড়িয়ে সেখানেও ফুড ক্রাইসিস ঘটাবার দরকার কি? ফল এই হচ্ছে, যাঁরা রয়েছেন তাঁরা মাঝখান থেকে মারা যেতে বসেছেন, জাতের ওপর তাঁদের অভিশাপ পড়ছে।…বেশ তো, ধর্ম যেতে বসেছে বলে আপনার দুঃখ, দিন্ না মাঝেরপাড়ার বুড়ো শিবের মন্দিরটা ঠিক করে, বটগাছ অশথ গাছে মন্দিরটা চৌচির করে দিচ্ছে, দোরটা কে খুলে নিয়ে গেছে, যা একটু আলোচাল দুখানা বাতাসা কেউ দিয়ে যায়, শেয়াল কুকুরে বিগ্রহের গায়ের ওপর থেকে চেটে নিয়ে যায়। বেশ তো, সামলে দিন না, ধর্ম তো যাচ্ছে ঐখানে।"

পুরুত মশাই বলিলেন—"আহা-হা, ভোলানাথের তো ঐ রূপই, সে তত্ত্বকথা

তোমরা বুঝবে কোথা থেকে ? বট অশথ চান তাই জন্মায়, নয়তো সাধ্য কি জন্মাবার ; শ্মশানচারীর শেয়াল কুকুরই সাথী, তাই ডেকে নিয়ে আসেন, নৈলে…”

কেষ্ট মজুমদার একটা মোক্ষম বাণ ছাড়িলেন, বলিলেন—“না হয় ও মন্দিরটাও দেবেন’খন মেরামত করিয়ে…না হয় তার টাকাটা তোমার হাতেই তুলে দেবেন, তাহলে তো তোমার গান্ধী-মন্দির নিয়ে কিছু বলবার থাকবে না গো ?”

বিনোদ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—“মজুমদার মশাই, চোরাবাজারে আপনারা বড় হয়েছেন, ঘুষ খাওয়ানো হয়ে গেছে অব্যেস, আপনার মুখে কথাটা বেমানান হয় নি, তবে আমার তরফ থেকে বলি, আপনাদের টাকা হাতে করলে জীবনে আর আমার কোন প্রায়শ্চিত্তই থাকবে না, তা সে শিবমন্দির মেরামত করবার জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক। পুরুত মশাইয়ের কথা ধরেও শিব ঠাকুরের তরফ থেকে বলতে পারি, আপনাদের টাকা তাঁর মন্দিরে ঢোকার চেয়ে শেয়াল কুকুর ঢোকা তিনি ভালো মনে করেন বলেই আপনাদের মতিগতি টানেন নি ওঁর দিকে। আপনারা নাচাবেনই চাটুজ্যে মশাইকে, নৈলে আপনাদের ইঁট, লোহা চোরা গুদামের সিমেণ্টের বোরা দরে বিকোবে কি করে ? পুরুত মশাইয়ের তেত্রিশ কোটির ওপর যতো বাড়ে ততোই সুবিধে। থাকুন লেগে সব, পাপের পয়সা যতদিক দিয়ে যায় ততোই ভালো ; আমি শুধু আমার মতটা বলে গেলাম।”

ওরা একদিক দিয়া গান্ধীজীর পূজারী হইবার সত্যই উপযোগী, চটিতে জানে না কেউ, মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল ; রমণী চাটুজ্যে বলিলেন—“তোমার মত ! তা তো বটেই ! তা না থাকে মত তোমার, কিষাণ-মজুর দিয়ে ভাঙিয়েই দিও মন্দিরটা। শহরে আর সবাইও তো তোমার দলেই বেশি গো।”

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"চাটুজ্যে মশাই, কথাটা আপনি দুবার বললেন, তাহলে জেনে রাখুন ঠিক না ভাঙলেও গড়া বন্ধ করা এমন কিছু শক্ত নয় বিনোদ মুখুজ্যের পক্ষে।"



হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হইল, চাটুজ্যে বলিলেন—"তাই ক'রো চেষ্টা।" বিনোদ ঘুরিয়া হন হন করিয়া চলিয়া আসিল।

২

বাড়ি আসিয়া মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে মনে হইল এরকম চটাচটি করিয়া আসাটা ভুল হইয়াছে ; ওর কেমন একটা রোগ, মেজাজ হারাইয়াই বসিবে ; বিশেষ করিয়া এদের সংস্পর্শে আসিলে, তাহার পর অনুশোচনা আসিবে, আবার খানিকটা সত্যাগ্রহীরও ভাব আছে কিনা, জীবনটা এদিকে আবার গান্ধীজীর আদর্শেই তো গড়িতেছে।

মাথা আরও খানিকটা ঠাণ্ডা হইলে বিনোদ মনে মনে শিহরিয়াই উঠিল—এযে চাটুজ্যের একটা প্রকাণ্ড চাল, এর মধ্যে ভক্তি কোথায় চুলার ছাই ?

—কুলি-মজুরগুলো ক্রমাগতই বেহাত হইয়া যাইতেছে, কথায় কথায় ধর্মঘট, শহরে পাঁচটা কল, তার মধ্যে তিনটে ওঁর নিজের, একরকম অকর্মণ্যই হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে, গান্ধী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বুড়ো রমণী চাটুজ্যে এই বেগটাকে চায় ঠেকাইয়া রাখিতে। কতদুর সম্ভব সে আলাদা কথা, কিন্তু চেষ্টা করিতেছে।

সবচেয়ে ভুল হইয়াছে বিনোদের, শেষের দিকে ঐরকম করিয়া শাসাইয়া আসা। এতে বাধা দিতে গেলে সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবে যে। —কুলিমজুরদের মধ্যে ওর প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে একেবারে। ওদের ইচ্ছাটা, বিনোদ দেয় ফাঁদে পা, সেইজন্য চাটুজ্যে অমন মিষ্ট হাসিয়া বলিল—সে নিজের কিষাণ-মজুর লইয়া ভাঙুক না মন্দিরটা।...এ ভুলটা করিলে চাটুজ্যে দুহাতে মেঠাই বণ্টন করে সারা শহরটায়।

যেমন রাগের মাথায় কাজ পণ্ড করিয়া বসে, তেমনি মন ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া আবার সামলাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই চালাইয়া যাইতেছে বিনোদ এত বাধাবিঘ্নের মধ্যে। স্থিরভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ গেল, কিছু আসেই না মাথায়, তাহার পর মনে হইল একটা উপায় যেন হইতে পারে। আরও স্থির মনে ভাবিতে ভাবিতে সেটা বেশ একটা স্পষ্ট

আকার গ্রহণ করিল। বুদ্ধির চালে মাৎ করিবার মধ্যে বেশ একটা সূক্ষ্ম আনন্দ আছে, দুষ্টামির হাসিতে বিনোদের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মেজাজটা বেশ সংযত করিয়া লইয়া রাত প্রায় নটার সময় বিনোদ গিয়া চাটুজ্যে মশাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইল। এই সময়টা একলাও থাকেন আর আজকাল একটানা লাভের মরশুম চলিয়াছে বলিয়া সমস্ত দিনের হিসাব নিকাশের পর মনটাও বেশ ভালো থাকে।

বৈঠকখানায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কাৎ হইয়া গড়গড়া সেবন করিতে-ছিলেন, বিনোদ গিয়া তক্তপোষের একপাশে কাঁচুমাচু হইয়া বসিল। চাটুজ্যে মশাই প্রশ্ন করিলেন—"খবর কি বিনোদের? রাত্তিরে যে হঠাৎ আবার?"

বিনোদ বলিল—"সমস্ত দিনটা বড় অশান্তিতে কেটেছে দাদামশাই—সেই যে আপনার ওখান থেকে উঠে গেলাম সেই ইস্তক; তাই মনে করলাম ভুলটা স্বীকার করে আসি দাদামশাইয়ের কাছে, নৈলে ঘুম হবে না রাত্তিরে।"

ভূতের মুখে রাম নাম, চাটুজ্যে মশাই কোন উত্তর না দিয়া একটু ঘনঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া বিনোদই বলিল—"ঐ মন্দির করার কথা বলছিলাম—মহাত্মাজীর মন্দির। ট্রেন থেকে নেমেই তেতেপুড়ে ছুটে এসেছিলাম আপনার কাছে, অতটা ভেবে দেখিনি, এখন যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে আমারই তো ভুল। দাদামশাই একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছেন—এতবড় একটা কাজ—আর আমি কিনা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি—মনটা এমন খারাপ হয়ে আছে! কালাপাহাড় তো নয়—বলুন না দাদামশাই?"

চাটুজ্যে মশাই ঠোঁটের কোণে একটু হাসিয়া বলিলেন—"বুড়ো বলে একেবারে ঠেলে দাও ভাই, না বুঝে সুঝেই কি করি একটা কাজ? দেশের কত পুণ্যির জোর এতদিন পরে এমন একটা মানুষ জন্মাল, তার একটা

মন্দির করে দিলাম তো কি এমন করলাম ? যাক্, বুঝেছ যে এইটিই সুখের বিষয়। আমারও মনটা খারাপই যাচ্ছিল—বলি, বিনোদ এমন বুদ্ধিমান ছেলে, সে আমার মনের ভেতরটা দেখলে না, কিনা রুখে এসে দাঁড়াল !"

"রুখে দাঁড়াব এমন সাধ্যি কি আমার দাদামশাই ? তবে হ্যাঁ, আপত্তি করেছিলাম বৈকি—অস্বীকার করতে পারি কি সেকথা ? তারপরে ভেবে দেখলাম···বা রে ! দেবতাদের মধ্যে আবার ভিড় কি ? সেখানে সত্যি তো আর অন্নসমস্যা ঘটছে না আমাদের মতন যে তার কথা,—শিবঠাকুর তিনি একটু গঙ্গাজল বিল্বিপত্র পেলেই খুশি, গান্ধীজীরও প্রায় তথৈবচ, এক ছটাক ছাগল দুধ—এমন নয় যে মন্দির করে দলে তুলে দেওয়া হোল বলে দেবতাদের অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগাবেন। বলুন না দাদামশাই ?"

"কেন, শিবঠাকুরের ঐ মন্দিরটুকুই সারিয়ে দোব না বলেছি কি কখনও ? আমায় জানাবে না কেউ, কি করি বলো ? দেখছ তো ব্যবসার যা অবস্থা, 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' হয়ে রয়েছি। তুমি বললে তখন, সেই থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে রয়েছে—তাই তো, বিনোদটা চটাচটি করে হুট করে উঠে গেল, নৈলে দিয়ে দিলে হোত শ'খানেক টাকা, হাত লাগিয়ে দিত ; শহরে সব রয়েছি আর মন্দিরটা নষ্ট হয়ে যায় !"

"তাহলে অপরাধ করেছি বলে বাদ দেবেন না যেন দাদামশাই—পুণ্যের কাজ একটা, নাতিকেও ডেকে ডুকে একটু বখরা দেবেন···"

"বখরা দেওয়া মানে ? তোমাদেরই কাজ, আমি তো নিমিত্ত মাত্র ; তোমরাই করবে কর্মাবে, আমায় যখন ডাকবে গিয়ে হাজির হব। টাকা দিয়েই খালাস। কাল পুরুতমশাই দিন ঠিক করে দিলেন—সাতাশে আষাঢ় একটা যজ্ঞ করে মহাত্মাজীর পূজো করে বুনেদ দেওয়া হবে মন্দিরের—আর টেনে টুনে হদ্দ পনেরটা দিন হাতে রয়েছে, উঠে পড়ে লাগো সবাই।······ বিনোদ উলটে বলে—দাদামশাই, পুণ্যির কাজের একটু বখরা দেবেন,—কাজ যেন দাদামশাইয়ের !"

বেশ সহজেই উদ্দেশ্য হাসিল হইল, এত সহজে হইবে আশা ছিল না। বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এবার তাহলে যাই দাদামশাই ; ঐ কথা বলতে এসেছিলাম—ভাবলাম—দাদামশাইয়ের কাছে অপরাধটা স্বীকার না করে এলে ঘুম হবে না রাত্তিরে !"

দরজার দিকে পা বাড়াইতে চাটুজ্যে মশাই বলিলেন—"দাঁড়াও একটু, শুভকাজে বিলম্ব করে না, বলে মানুষের পরমায়ু—পদ্মপত্রে জলবিন্দু, গড়িয়ে পড়লেই হোল ; কথাটা যখন মনে পড়েছে, আর তুমিও যখন এসেছ···"

বলিতে বলিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন ; একটু পরে বাহির হইয়া আসিয়া একশ টাকার একখানি নোট বাড়াইয়া বলিলেন—"এই ধরো, মাঝপাড়ার শিবমন্দিরটাতেও হাত লাগিয়ে দাও ; বুড়ো ভাববে—দেখেছ, নতুন দেবতা হয়েছে, এখন বুড়োরা আর কলকে পায় না !"

—মস্ত বড় সওদা খরিদ করিতেছেন, হাসি বাহির হইল নিজের রসিকতার অনুপাতে ঢের বেশি।

বিনোদের হাতটা উঠিতে গিয়া অল্প একটু যেন থামিয়া গেল, তাহার পরেই মনে মনে বোধ হয় আরও বেশি হাসিয়া, সে নোটটা পকেটস্থ করিল।



সাতাশে আষাঢ় আসিয়া পড়িল।

ছোট শহরটাতে রীতিমতো একটা সাড়া পড়িয়া গেছে। রমণী চাটুজ্যের চালের কল থেকে বিঘা কয়েক সরিয়া মন্দিরের জায়গা নির্ধারিত হইয়াছে। সামনের যে জা:গাটায় পুকুর খোঁড়া হইবে. সেটা পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর খানচারেক সামিয়ানা খাড়া করা হইয়াছে। শহরের বিস্তর লোক জড় হইয়াছে, বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর। খান পাঁচেক মিল শহরে, গান্ধীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্য করিয়া সবগুলাই বন্ধ রাখা হইয়াছে ; কুলিদের মন ভাঙাইবার

জন্যই মন্দির, সেদিক দিয়া এখন পর্যন্ত বেশ ফল পাওয়া গেছে, দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে তাহারা, মাঝে মাঝে "গান্ধীজী কী জয়!" রবে সমস্ত জায়গাটা গমগম করিয়া উঠিতেছে।

সামনে মন্দিরের বুনেদ খোঁড়া হইয়াছে। মাঝখানে চাটুজ্যে মশাইয়ের গদি থেকে গান্ধীজীর ছবিটা আনিয়া খদ্দরের ফুলের মালায় ভূষিত করিয়া একটা বেদীর উপর বসানো হইয়াছে। একটু দূরে আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে লইয়া নিবারণ ভট্টাচার্যি হোম করিতেছেন, ডালডার গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ম-ম করিতেছে।

রমণী চাটুজ্যে আরও একটা ছোট খদ্দর পরিয়াছেন আজ, মুখে বিনয়ের হাসি, চারিদিকে তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহারও নামে জয়ধ্বনি উঠিতেছে, মাথা নিচু করিয়া করজোড়ে মৃদু হাস্যের সহিত গ্রহণ করিতেছেন।

আজ সত্যই তাঁহার জয়জয়কার। বিনোদ পর্যন্ত নাই, কয়েকদিন হইতেই সে অনুপস্থিত; বাহিরে কোথায় গিয়াছে। নাই, ভালোই হইয়াছে, তবু বিজয়ের উল্লাসে এক একবার মনে হইতেছে হতভাগাটা থাকিলেই হইত ভালো, ব্যাপারখানা স্বচক্ষে দেখিত।

বিকাল পর্যন্ত যজ্ঞ শেষ হইল। কিছু বক্তৃতা হইবে, গান্ধী-মন্দিরের উদ্দেশ্যটা বুঝাইয়া দিবার জন্য, তাহার পর বুনেদ দেবার সময়।

বক্তাদের জন্য একটা মঞ্চগোছের তৈয়ার হইয়াছে। তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে রমণী চাটুজ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখা গেল যাত্রার সঙেরা যেমন ভাবে নাটমঞ্চে প্রবেশ করে সেইভাবে একটা ছোট দল ভিড় চিরিয়া প্রবেশ করিতেছে,—সামনে বিনোদ, তাহার পিছনে প্রকাণ্ড দুইটি পিতলের হাণ্ডা মাথায় করিয়া দুইটি কুলি, তাহার পিছনে বড় বড় তিনটে চাঙারি মাথায় করিয়া তিনটে আরও লোক, চাঙারিগুলোতে ছোট ছোট খুরি। একটু দূরে একটা ছোঁড়া একটা রাম-ছাগ্‌লিকে টানিয়া

আনিতেছে, পশ্চিমা ছাগলিদের মতো তাহার পাল্লান্টা একটা ছোট থলিতে কোমরের সঙ্গে বাঁধা, ভিড় দেখিয়া প্রবেশ করিতে প্রবল আপত্তি লাগাইয়াছে, ছেলেটা ততই টানাটানি করিতেছে। পিঠে-পা-ওলা ধর্ম-গাইয়ের মতো একটা রহস্যজনক ছাগল ভাবিয়া লোকেরা তটস্থ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

মিছিল দেখিয়া রমণী চাটুজ্যের মুখটা শুকাইয়া গেল। বক্তৃতা-মঞ্চের কাছে আসিয়া হাণ্ডা, চাঙারিগুলোকে আর ছাগলটাকে গোছগাছ করিয়া রাখিতে যতটা সময় গেল তিনি যেন জবুথবু হইয়া নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন, তাহার পর বিনোদকে কোন রকম প্রশ্ন না করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সবার সামনে নিজের বক্তব্যটা বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। মস্তিষ্ক বেশ কাজ করিতেছে না—এ বিপুল আর বিচিত্র সরঞ্জাম কোথা থেকে হাজির করিল বিনোদ, উদ্দেশ্যটাই বা কি!

চাটুজ্যে মশাই বসিলে বিনোদ উঠিল। কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া আরম্ভ করিল—

ভাই সব, তোমরা পূজ্যপাদ চাটুজ্যে মশাই যা বললেন সবই শুনলে। গান্ধীজী যে একজন দেবতা একথা ওঁর সঙ্গে আমরা সবাই-ই আজ বিশ্বাস করতে বাধ্য। চরিত্রগুণে এবং কর্ম-শক্তিতে উনি অনেক দেবতাকেও যে পেছনে ফেলে যান একথা আজ কে অস্বীকার করতে পারে? এহেন দেবতা আমাদের শহরে প্রতিষ্ঠিত করে সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন চাটুজ্যে মশাই। আমি এই শুভদিনটিকে আরও মহিমান্বিত করবার জন্যে একটা কাজ করেছি—আপনাদের অনুমতি না নিয়ে, কিন্তু ভরসা আছে আপত্তির কিছু থাকবে না। আপনারা জানেন আমি কিছুদিন এখানে ছিলাম না; আসলে আমি গিয়েছিলাম মহাত্মাজীরই কাছে। ভাবলাম, দেবতা যখন বেঁচেই রয়েছেন আমাদের মধ্যে, তখন তাঁর এই পূজোর দিনে যদি তাঁর সত্যিকার প্রসাদ সবার মুখে একটু একটু দিতে পারি তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কি হোতে পারে। আপনারা জানেন তিনি কত বিনয়ী, কত মহান; তাঁকে

দেবতা বললে তিনি কত সঙ্কুচিত হন বেহারের একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে সে খবর বোধ হয় পেয়েছেন আপনারা। তবু আমি উপোস করে মরব ভয় দেখিয়ে অনেক কষ্টে তাঁর নিজের মুখের একটু প্রসাদ নিয়ে আসতে পেরেছি—জানেনই তো একটা প্রাণের জন্যে কত দরদ তাঁর, দয়া করে ভোগের দুধের জন্যে এই ছাগলিটি পর্যন্ত দিয়েছেন। এখানে এসে এই দু'হাঁড়ি পায়েস করে তার সঙ্গে তাঁর সেই মুখের প্রসাদ মিশিয়ে দিয়ে সমস্তটাকে পবিত্র করে নিয়েছি। এইবার আপনারা সেই প্রসাদ পেয়ে ধন্য হবেন।"

"মহাত্মাজীকী জয়! বিনোদবাবুকী জয়!" বলিয়া একটা তুমুল আনন্দ-কল্লোল উঠিল। থামিলে বিনোদ বলিল—"কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ প্রসাদ সর্বাগ্রে আপনারা পেতে পারেন না, সব ব্যাপারেই একটা অধিকারভেদ আছে। সবচেয়ে আগে এ প্রসাদ আজকে যিনি পৌরোহিত্য করেছেন তাঁর প্রাপ্য। সুতরাং আপনাদের অনুমতি নিয়ে তাঁকেই আগে দিই আমি। তাঁকে তাঁর যোগ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি কখনই আমাদের ক্ষমা করবেন না।"

নিবারণ ভট্চার্যি রগচটা মানুষ, তায় উপবাস করিয়া আছেন, বিনোদের পানে আড়চোখে চাহিয়া তাহার কূট চালে ভিতরে ভিতরে গুমরাইতেছিলেন, পায়স ভর্তি করিয়া খুরিটা সামনে ধরিতেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন,—স্থানকালপাত্র ভুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কী!—আমি পঞ্চানন সার্বভৌমের সন্তান, আমায় বেনের প্রসাদ খেতে হবে? এতবড স্পর্ধার কথা বলে আমায় অর্বাচীন!"

হাতের একটা ঝটকা দিতে খুরিটা ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

বিনোদ যেন গভীর নিরাশায় হতভম্ব হইয়া মাথা নিচু করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া কুণ্ঠিতভাবে আবার সবার দিকে চাহিয়া বলিল—"দেবতার জাত নেই বলেই আমি জানতাম, তাই এই সাহসটা করেছিলাম। যাই হোক, যিনি এই শুভকাজে আসল উদ্যোক্তা—যিনি

দেবতাকে সবচেয়ে বেশি করে চিনেছেন, তিনি নিশ্চয় আমাদের পথ দেখাবেন!”

আর এক খুরি ভর্তি করিয়া চাটুজ্যে মশাইয়ের সামনে ধরিল।

নিজের হারটা উপলব্ধি করিয়া চাটুজ্যে মশাই রাগে আক্রোশে তখন কাঁপিতেছেন, কাহাকে কামড়াইবেন কাহাকে আঁচড়াইবেন যেন ঠিক করিতে না পারিয়া একেবারে নিবারণ ভট্‌চায্যির দিকে ঘুরিয়া বলিলেন—“আর আমার পূর্বপুরুষেরা বুঝি চামার ছিল মশাই? ঐ পেসাদ মুখে দিতে হবে আমায়! লোকে পঞ্চানন সার্বভৌমের নাম শুনেছে আর বাসুদেব বাচস্পতির নাম শোনে নি? আমি এই উনসত্তর জাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ বেনের মুখের উচ্ছিষ্ট…”

একটা হট্টগোল উঠিতেছিল, বিনোদ আবার দাঁড়াইয়া গলা উঁচাইয়া বলিল—“ভাই সব, কিছু লুকোচুরি নয়, সমস্ত ব্যাপারটা তোমাদের চোখের সামনেই হোল; তোমরা কি চাও যিনি সত্যিই তোমাদের হৃদয়ে দেবতা হয়ে রয়েছেন তিনি এতবড় অপমানের মধ্যে তোমাদের শহরে প্রতিষ্ঠিত হন?……হলে প্রতিদিনই কি তাঁকে এঁদের হাতে এইরকমভাবে অপমানিত হতে হবে না? চাও কি তোমরা সবাই সেটা?”

একটা তুমুল হট্টগোল উঠিল—“না, কখনও না……সব বুজরুকি! সব ধাপ্পাবাজী!”

আরও বাড়িল গোলমাল, লোকেরা দাঁড়াইয়া উঠিল।—“গান্ধীজী কি জয়! বিনোদবাবুকী জয়!…আমরা এ অপমানের জবাবদিহি চাই!”

সাহস বাড়িয়া যাইতেছে জনতার, একটা বেশ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“ওই পেসাদ কেন মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে না ওঁদের?……আগে পুরুত মশাইয়ের মাথায়……”

—এ ধরণের প্রশ্ন যে উঠিবেই সে আন্দাজটা চাটুজ্যের দল করিয়াইছিল;

মঞ্চের উপরও একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেছে। প্রসাদ ঢালিবার জন্য মাথার খোঁজটা প্রবল হইবার পূর্বেই নিঃসাড়ে সরিয়া পড়িল।

শিবমন্দির মেরামতের কয়েকটা টাকা পায়সে আর ছাগলে গেল বটে, কিন্তু অনেক কাজ হইল—ওদিকে দেবতারাও বাঁচিলেন এদিকে গান্ধীজীও বাঁচিলেন। বিনোদের শুধু দুঃখ চাটুজ্যের যে ক'টা পাপের টাকা কুলি-মজুরের পেটে যাইত সে ক'টা মাঝখান থেকে উহারই পকেটে রহিয়া গেল।

সেগুলাও সুদে আসলে বাহির করিয়া লইবার চিন্তা করিতেছে সে।

কবিতা

কুণ্ডনলালের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াইয়া গেছে। লোকটি চমৎকার। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, সমস্ত বাংলা বিহার ব্যাপিয়া নানা প্রকারের ফলাও ব্যবসা, কিন্তু শরীরে এতটুকু অহঙ্কার নাই। তবে লক্ষ্মীকে লইয়া অহঙ্কার না থাকিলেও তাঁহার ভগ্নীকে লইয়া অহংকার আছে। কুণ্ডনলাল একজন কবি। সেটা আবিষ্কার হয় নিতান্ত আকস্মিকভাবে এবং প্রথমটা বেশ লজ্জিতও হইয়া পড়েন। কিন্তু একবার সেভাবটা কাটিয়া যাওয়ার পর আর কোন দ্বিধা করেন না আমার সামনে। লিখিলেই শোনান, মতামত জিজ্ঞাসা করেন, যা পান সবই অনুকূল,—বেশ গর্ব অনুভব করেন।

যেখানে গর্বের আছে সেখানে গর্ব নাই, আর যেখানে গর্বের কিছুই নাই সেখানেই গর্ব—ওঁর চরিত্রের এই দিকটা বড় ভালো লাগে। কুণ্ডনলাল একটু সোজা হইয়া বসেন, বলেন—"এখন আমি এ-সোব ছাপাবো না বাঙ্গালীবাবু—বাজার দেখছি, তারপর যখন ওনেক জমা হোবে কেতাব বানিয়ে একেবারে বাজার হাঁত করে লিবো।"

বাজার না বুঝিয়া কুণ্ডনলাল কেতাব ছাড়িবেন না, কেতাব পাঁচ জনের হাতে না পড়িলে তাঁহার মোহ ঘুচিবেও না; আমি নিশ্চিন্ত মনে তারিফ করিয়া যাই, কুণ্ডনলাল লিখিয়া যান। প্রবাসের তিনটা মাস এই করিয়া কাটিল। ছাড়াছাড়ির সময় কুণ্ডনলাল খুব আগ্রহ করিয়া, হনুমানজির শপথ দিয়া বলিলেন কলিকাতায় যাইলে আমি যেন নিশ্চয়ই বড়বাজারে ওঁর গোয়েঙ্কা-লেনের বাড়িতে গিয়া দেখা করি।

সেই দেখা করিতে গিয়াছি। নিচে বেশ বড় গদি; রাশি রাশি খেরো খাতার স্তূপ, অনেক মুনিম কর্মচারী, প্রচুর বিশৃঙ্খলা, তবে মা-লক্ষ্মী যে

শৃঙ্খলিতা আছেন সেটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। একটি কর্মচারীকে বলিতে সে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল যদি কিছু "লেনদেনের মামলা" থাকে তো তাহাকেই বলিতে, শেঠজি এখন নামিতে পারিবেন না।

চলিয়া আসিতে আসিতে আবার কি মনে হইল, ফিরিয়া গেলাম, নিজের নামটা জানাইয়া বলিলাম খবর দিতে—এই নামের বাবু আসিয়া দেখা করিতে চাহিতেছেন—সন্দিপ দ্বীপের কাছে একটি জায়গায় যাঁর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

লোকটা আমার মুখের পানে একটু চাহিয়া দেখিল, মনে হইল কুণ্ডনলাল প্রবাসের গল্প প্রসঙ্গে আমার কথা এখানে বলিয়া থাকিবেন। আর কিছু না বলিয়া একটা লোক ডাকিয়া উপরে খবরটা দিয়া আসিতে বলিল। লোকটা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল 'কবিতাভবনে' আমার ডাক হইয়াছে, তাহার পিছনে পিছনে সিঁড়ির খানিকটা উঠিতেই দেখি কুণ্ডনলাল তাড়াতাড়ি নিজেই নামিয়া আসিতেছেন। অভিবাদনান্তে আমায় সঙ্গে করিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন।

ছোটখাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটি। বাহিরে একটি পিতলের ফলকে হিন্দিতে লেখা 'কবিতা-ভবন'। ভিতরে, খুব বেশি না হোক, দুইটি আলমারিতে অনেকগুলি হিন্দি বই, একেবারে গায়ে গায়ে সাঁটা ঝকঝকে ফ্রেমে বাঁধানো অনেকগুলি ছবি। পাশেই বারান্দায় টবে করিয়া কয়েকরকম গাছ। সিঁড়ির পাশে এবং ওদিকটায় বারান্দাতেও অনেকগুলি রাশীকৃত খেরো-বাঁধানো খাতা, কয়েকরকম পাটের নমুনা, বোধ হয় নমুনা হিসাবেই দুই জায়গায় গাদি করা। কিছু লোহা আর কাঠের টুকরাও নজরে পড়িল। এই কোণটুকু কিন্তু একেবারেই আলাদা—দেখিলেই মনে হয় কুণ্ডনলাল বেশ যত্নসহকারেই তাঁহার সরস্বতীর আস্তানাটুকু লক্ষ্মীর ঈর্ষাদৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বেশ তৃপ্তি বোধ হইল।

আলাপ আরম্ভ হইল। একটা লোক ডাকিয়া কুণ্ডনলাল সরবৎ, পান,

প্রভৃতি 'খাতির'এর সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। লোকটা চলিয়া গেলে বলিলেন—"এইটি আমার কবিতা লিখবার ঘোর আছে বাঙ্গালী বাবু; যোখোন এখানে থাকি, দুনিয়া উলট্ যাক্, সোবার আসতে মানা।"

বলিলাম—"তাহ'লে তো বড্ড অন্যায় করে ফেলেছি শেঠজি।"

কুণ্ডনলাল হাসিয়া আমার হাতটা ধরিয়া বলিলেন—"না, না আপকী বাৎ অলগ্ বাঙ্গালী বাবু,—আপনার কোথা আলাদা, এ তো আপনার মোতন লোকেরই জায়গা। ···অন্য সোবার মানা···"

তাহার পর আমার হাতটা আরও একটু চাপিয়া, মুখটা আরও বাড়াইয়া আনিয়া বেশ বেদনাতুর কণ্ঠেই বলিলেন—"বোড়ো হয়রান কোরে বাঙ্গালীবাবু, যো কোই আসে, খালি লেনদেনের কোথা, সোনার দর, তিসির ভাও, জান হয়রান কোরে দেয়। আমি চাই নিশ্চিন্ত্ হোয়ে বোসে বোসে খালি কবিতা লিখি, লেকিন···"

মনটি এমন খুলিয়া ধরিলেন যে আমাদের কাব্যালোচনা সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জমিয়া উঠিল। বলিলাম—"আপনার যখন এতই আগ্রহ, দেবী নিশ্চয় সদয়া হবেন শেঠজি। আর, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেকার সাধনাই তো আসল সাধনা। এর মধ্যে থেকে প্রাণের আগ্রহে যে কবিতা বেরুবে তার তুলনা কি অন্য কোথাও?"

একটা ছোট টেবিলের সামনে বসিয়া আমরা গল্প করিতেছিলাম, টেবিলের একপাশে একটি টাটকা ফুলের মালা একটি রেকাবিতে জড়ো করা, পাশেই একটা হিন্দি মাসিক পত্রিকা; কুণ্ডনলাল সেটা সরাইয়া পাশে রাখিতে একটি বাঁধানো খাতা আত্মপ্রকাশ করিল; কুণ্ডনলাল কিছু না বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিতভাবে একটু মৃদুহাস্য করিলেন। অবশ্য কবিতা লইয়া আমার কাছে আর সঙ্কোচ নাই ওঁর, তবে নিতান্তই নাকি অনেক দিন পরে দেখা, একটু কুণ্ঠা আসিয়া পড়িলই।

আমি একটু উৎফুল্লভাবে বলিলাম—"শেঠজির কবিতার খাতা বলে মনে

হচ্ছে, ইতিমধ্যে আর কি কি লিখলেন শোনবার কৌতূহল হয়, যদি আপত্তি না থাকে তো…”

কুণ্ডনলাল গোটা তিনেক কবিতা আমায় পড়িয়া শোনাইলেন। সবগুলিই বিরহের, তুলসীদাসের দোহা'র ছন্দে লেখা এবং সীতাবিরহের সময় রামের বিলাপের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আমাদের অন্তরঙ্গতা এদিকে বাড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া আমরা নিগূঢ় রহস্যালাপও চালাইতাম মাঝে মাঝে; কবিতার যথোচিত প্রশংসা করিয়া একটু হাসিয়া বলিলাম—“এতে যে রকম সত্যিকার বিরহের ভাব ফুটে উঠেছে তাতে মনে হয়…”

কুণ্ডনলাল আবার আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিলেন, উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিলেন—“সচ্ বোলছেন বাঙ্গালীবাবু—অসল্ বিরোহের ভাব জাহির হয়েছে কবিতাতে ?”

আমি মুখের পানে একটু আড়ে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—“সেই কথাই তো বলছিলাম শেঠজি,—আমার আশঙ্কা হচ্ছে শ্রীমতী এখন এখানে নেই—অনেকদিনই; আপনার নিজেরও বিরহের দশাই চলছে; নিজের প্রাণ দিয়ে অনুভব না করলে এরকম খাঁটি জিনিস কলমের ডগা দিয়ে…”

কুণ্ডনলাল আমার হাতটা আরও আবেগভরে চাপিয়া ধরিলেন; বিরহের কথাটা সোজা স্বীকার না করিলেও বেদনাস্তিমিত কণ্ঠে বলিলেন—“আমি হামেসা এই সোব কারবারী কোথা বলতে বলতে, শুনতে শুনতে হয়রান হয়ে গেছি বাঙ্গালীবাবু, জানে হনুমানজি; কেবোল চাল্‌কা দর, সোনাকা দর…আমার প্রাণ চায় সিরুফ্ বোসে বোসে এই রোকম কবিতা লিখতে। আপনি কবিতা পড়েই মালুম করে নিয়েছেন—সচ্‌মুচ্ আমার মোনে রত্তিভর চৈন নেই বাঙ্গালীবাবু, নিজের জান্ এই কবিতার মধ্যে ঢেলে কুছ-কুছ্ আরাম পাই—তা যে কেউ আসুক, কেবোল কারবারী বাৎ, কেবোল কারবারী বাৎ…”

কষ্ট হইল, একটা নূতন ধরণের অনুভূতিও আসিল মনে—আমরা এদের অর্থের দিকটাই দেখি, কিন্তু সেই অর্থের পিছনেও যে এক একটি আত্মা কি রকম পীড়িত, ভাবিয়া দেখি না। একটু বোধ হয় হালকাভাবেই আলোচনা করিতেছিলাম এতক্ষণ, এবার সত্যই আন্তরিক সহানুভূতির স্বরে বলিলাম—"আপনার কথা শুনে সত্যই মর্মাহত হলাম শেঠজি; প্রাণের যে সময় যেটা সবচেয়ে গভীর অনুভূতি সেটাকে যে কোন কারণেই আঘাত দেওয়া বড় একটা নির্মম কাণ্ড বলেই মনে হয় আমার। প্রাণ যখন চাইছে কাঁদতে, তাকে শুধু কাঁদতে দেওয়াই ভালো নয়, বরং এমন কিছু করাই সঙ্গত মনে করি যাতে সেই কান্না আরও ব্যথাতুর হয়ে উঠতে, আরও বেগবান হয়ে উঠতে পারে। কাব্যের এইখানেই তো সার্থকতা, এইখানেই তো প্রয়োজন কবির; এর মধ্যে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতো কেউ যদি এসে বাধা..."

আমায় থামিয়া যাইতে হইল; কুণ্ডনলাল মুখটা অল্প একটু ঘুরাইয়া শুনিতেছিলেন, হঠাৎ রুমাল বাহির করিয়া ডান চোখের কোণটা মুছিলেন। একটু বোধ হয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু গভীর সহানুভূতির আভাস পাইয়া ওঁর মনের কপাটটা আরও গেল খুলিয়া; একটু যেন ভারী গলাতেই বলিলেন—"আজ ঢাই মাস এখান থেকে গেছে বাঙ্গালীবাবু—পাটনায় বাপেরবাড়ি গেছে, সিরিফ্ দুখানা খৎ পেয়েছি; চারদিন আগে আখরি খৎ পেয়েছি তাতে লিখেছে শরীর খারাপ আছে—জ্বর হোয়। জ্বর অবশ্য্ বেশি নয়, লেকিন তবভি..."

মনটা বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল। হালকাভাবে আলাপ করিতে করিতে মর্মের একী এক অতি বেদনা-কোমল জায়গায় আসিয়া পড়া গেল! কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাবিতেছি এমন সময় পাশের ঘরেই ক্রিং ক্রিং করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

কুণ্ডনলাল সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া পা বাড়াইলেন; আমার পানে একবার ঘুরিয়া চাহিয়া বলিলেন—"এক মিনিট বাঙ্গালীবাবু; মাফ করবেন।"

দুইটা ঘরের মধ্যে একটা দুয়ার, রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন—



"হাঁ···শেঠ কুণ্ডনলাল।···কাঁহাকা ফোন্? ট্রাঙ্ক কল? পাটনা, শেঠ মংনিরাম?···আচ্ছা, দিজিয়ে কনেকশন।"

কনেকশন দিতে যেটুকু সময় গেল তাহাতে কুণ্ডনলাল একবার আমার পানে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"আমার শালা, বাঙ্গালীবাবু, পাটনাসে···"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘুরিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন, আমি একটু আগ্রহের সহিতই শুনিতে লাগিলাম—

"কে, মংনিরামজি ?···রাম-রাম···হেসিয়ান্‌মে বার হাজার নফা নিকলা ?—সায়ক্‌রা পচ্‌হত্তর !···জয় মহাবীরজিকি ! কেয়া কহা ?—তিসিকা ভাও আওরভি চঢ়েগা ? তো পন্দ্রহ হাজার মন খরিদ লিজিয়ে মেরা নামসে।··· ওয়াগনকে বাস্তে ? তো বেশ, দে দিজিয়ে জিংনা মাংগে।···নেহি, সোনা আভি গিরেগা—জাপানী লোগ জোর কিয়া আসামমে ; আচ্ছা দশ হাজারমে ছোড় দিজিয়ে—কমহি নফা সহি।···হাঁ, হেসিয়ান্‌মে অওর বিশ হাজার।··· আচ্ছা রাম-রাম।"

আনন্দে উৎসাহে মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন—"মেরা শালা, মংনিরামজি, বাঙ্গালীবাবু, সিটির বোড়ো মার্চেন্ট—হেসিয়ানে বার হাজার নফা হয়ে গেলো—বার হাজার! —এক বাৎসে ! বললাম আরও বিশ হাজার লাগিয়ে দিতে—শতকরা পঁছত্তর হোলে বিশ হাজারে হোলো···হিসেবটা লাগিয়ে দেখুন বাঙ্গালীবাবু—সব মহাবীরজির কিরূপা···না, সোনা বারণ করে দিলাম বাঙ্গালীবাবু, সোনা আভি গিরবে ; বোরোং যা আছে ছেড়ে দিতে বোলে দিলাম—তওভি দশ হাজার রৈল,···গল্‌তি হোলো বাঙ্গালীবাবু ?"

এই সেই কুণ্ডনলাল নাকি !

মনটা একটু আগেই বেদনায় মথিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সে আবার কিসে মথিত হইয়া উঠিল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—বেদনা হইয়াছিল বলিয়া ধিক্কারে কি ? একটু হাসিয়া বলিলাম—"সেকি ! ওদিকে আপনার ভুল হ'তে পারে কখনও শেঠজি ? তবে অন্য একটা ভুল যেন···"

কুণ্ডনলাল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন—"কি, কি, কি ভুল বাঙ্গালীবাবু ?' '

একটু ম্লানভাবে বলিলাম—"আমার বলতে একটু বাধ-বাধ ঠেকছে—মানে, শ্রীমতীর অসুখের কথা বলছিলেন, তা আপনার সম্বন্ধীকে তো একটুও জিগ্যেস..."

কুণ্ডনলাল অনুতপ্তভাবে বাঁ রগের উপর হাতের তেলোটা চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অ-হ-হ! বোড্ডো ভুল হয়ে গেলো বাঙ্গালীবাবু, খুব সুবিস্তা ছিল। আচ্ছা, মালগাড়ির ওয়াগন মিললো কিনা যোখোন খবর দেবে তোখোন পুছে নোব, অবশ্য পুছে নোবো বাঙ্গালীবাবু, আপনি দেখবেন..."

সান্ত্বনাটা আমারই বেশি দরকার বটে! অবশ্য ততক্ষণ আর অপেক্ষা করিলাম না।

কাপড়

কয়েকজন একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল—"দাস্থ যাচ্ছে!…পাগলা দেসো!… দাস্থ!…ও দাস্থবাবু!…"

দূরে, এই রাস্তার আড়াআড়ি যে রাস্তাটা গেছে তাহার উপর দিয়া একটি লোক একটু মাথা গুঁজিয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া মুখ তুলিয়' দাঁড়াইল, তাহার পর আরও দু'একটা ডাকে এই দিকেই অগ্রসর হইল।

রবিবারের প্রভাতী মজলিসে আমি নবাগত ; এ খানিক, ও খানিক করিয়া বলিয়া আমায় পাগলা দাস্থর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া দিল। দাস্থ একটা ওয়ার্‌ ক্যাজুয়্যালটি (war casualty)। য়ুনিভার্সিটির সেরা ছেলে—ছাত্রদের যত রকম আন্দোলন সবেতে অগ্রণী, এদিকে জনসেবাতেও সেই রকম—যুদ্ধের হিড়িকে হঠাৎ মাথা গেল বিগড়াইয়া—সব সময় তাল ঠিক রাখিতে পারে না।

একজন হাসিয়া বলিল—"কোথায় হচ্ছে যুদ্ধ, এখানে দাস্থবাবু আমাদের টাল সামলাতে পারলেন না…"

অবসরের সভা, তর্কেরই ঝোঁক থাকে বেশি, এক পাশ থেকে অন্য একজন ফোঁস করিয়া উঠিল—"এটা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শ্মশান মশাই, কয়েক মাসে হাসতে-খেলতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে শুইয়ে দিলে।…শুধু একা দাস্থ পাগল হয়েছে, তার কারণ দেশে আর দাস্থ ছিল না…"

প্রতিবাদ উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় দাস্থ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হইবে, তবে অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশি দেখিলে মুখে যে একটা বার্ধক্যের ছাপ আসিয়া যায় সেটা বেশ স্পষ্ট। চুলগুলা বড় বড়, রুক্ষ আর অবিন্যস্ত। খালি পায়ে এক পা ধূলা, কাপড়টা ধূলায় লালচে হইয়া গেছে, গায়ে একটা ময়লা বোতামহীন পাঞ্জাবী। দৃষ্টিটা

যে উদ্‌ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, তবুও তাহার অনেক পিছনে একটা স্থির বুদ্ধির প্রশান্তি আছে।

আসিয়া ব্যঙ্গ-ঘেঁসা কতরকম উৎসুক প্রশ্নের মাঝখানে দাসু দোরের কাছটায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।…"কোথা থেকে দাসুবাবু?…কি ব্যাপার হে—ছিলে কোথায়?…দাসুবাবু চলেছে, যেন হিটলারের ডেথ্‌ ওয়ারেণ্ট সাইন করতে হবে!…"

আমি স্থির ভাবে দাসুর দিকে চাহিয়া একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি,—দৃষ্টির সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা মিলাইয়া তাহার পিছনের স্থির বুদ্ধির প্রশান্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে। দাসু যেন কোথায় ছিল, এবার বুঝিতে পারিতেছে কোথায়, কি ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে ধীরে ধীরে একটা হাসি ফুটিল, আর পাঁচজনের মতোই বেশ সহজ ভাবে বলিল—"ও, তোমাদের সান্‌ডে পার্লামেণ্ট্‌? একটা সিগারেট ছাড়ো দিকিন কেউ…?"

বেশ সহজ ভাবে গিয়া একটা চেয়ারে বসিল।

একজন সিগারেটের কেস খুলিয়া দাসুর সামনে ধরিল এবং সে একটা বাহির করিয়া লইলে একটু নাড়িয়া লইয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা দিল। সিগারেট ধরাইয়া গোটাকতক টান দিয়া দাসু হাসিয়াই বলিল—"আজকের মিটিঙের বিষয় কি—অ্যাজেণ্ডা?"

পাগল লইয়াই ঔৎসুক্য-কৌতূহল থাকে, প্রকৃতিস্থ হইয়া আসায় কাহারও আর সে-আগ্রহটা নাই, বরং আগেকার ব্যঙ্গের-টোনের জন্যে অনেকেই যেন একটু অপ্রতিভ, কাহারও আড়ালে অপ্রিয় কিছু বলিয়া যদি তখনই দেখা যায় সে পাশেই ছিল, সে-অবস্থায় ভাবটা যেমন হইয়া পড়ে। তবুও একজন হাসিয়াই বলিল—"এ পার্লামেণ্টের অ্যাজেণ্ডার কথা ছাড়ো, ওয়ার, প্রি-ওয়ার, পোস্ট-ওয়ার সব জিনিসই পাবে। তোমার লেটেস্ট বুলেটিন্‌ কি বলো—মানে, পার্লামেণ্টে রিপোর্ট করো।"

সঙ্গে সঙ্গেই বেশ স্পষ্ট একটা পরিবর্তন দেখা গেল। দাস্থর হাসি-হাসি ভাবটা মিলাইয়া গেল, কতকটা যেন নিভিয়া যাওয়া গোছের। পায়ের উপর পা দিয়া সিধা হইয়া বসিয়া ছিল, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া সামনের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে সিগারেট টানিতে লাগিল। আমি প্রথম থেকেই ওর প্রতি একটু বেশি অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ওর মনের মধ্যে পাগলামি আর প্রতিভার যেন একটা মস্ত বড় সংগ্রাম চলিয়াছে, দাস্থ যেন কি একটা প্রকাশ করিতে চায়—ঠিক যেমন ভাবে উচিত, কিন্তু তাহার জন্য মনের যা ব্যালান্স বা সাম্য সেটা যেন হারাইয়া ফেলিতেছে বা দ্রুত হারাইয়া ফেলিবার ভয় আছে।···চোখের মধ্যে মুহূর্তের স্থৈর্য আবার পরমুহূর্তেই উদ্‌ভ্রান্তির এমন আলোছায়া আমি আগে কোথাও দেখি নাই। ক্রমে বোধ হইল অনেক চেষ্টায় মনটি যেন মাঝামাঝি এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেখান থেকে সে নিজেকে প্রকাশ করিবার সাহসটুকু করিতে পারে। ঠিক এই সময় একজন ঘরের গাম্ভীর্যটা আরও একটু তরল করিয়া বলিল—"হাঁ, এমনভাবে যাচ্ছিলেন যেন মস্তবড় একটা ওয়ার-ট্রফি আপনাকে দেওয়া হবে—হিটলারের মাথাই হোক বা মুসোলিনির কাঁথাই হোক—তাই, প্রেজেণ্টেশ্যন সেরিমনিতে যাচ্ছিলেন···ব্যাপারটা···"

দাস্থ হঠাৎ বুক-পকেটে হাত দিতে, কথাটা মাঝপথেই থামিয়া গেল। পকেটে হাত রাখিয়া দাস্থ ক্ষণমাত্র কি একটু ভাবিল, তাহার পর পকেট থেকে একটা আন্দাজ চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি ধবধবে ন্যাকড়া বাহির করিয়া চৌকির উপর বিছাইয়া দিয়া বলিল "No, I have it on me already, this is the greatest war trophy yet" (না, আমার কাছেই আছে, এখন পর্যন্ত এর চেয়ে বড় লড়াইয়ের পুরস্কার আর হয় নি)। একটু সামনে চাহিয়া থাকিয়া সিগারেটে আরও দুইটা টান দিয়া প্রশ্ন করিল—"কি লেখা আছে পড়তে পারলেন?"

হঠাৎ একটা বিদ্রূপের চোট খাইয়া দাস্থর মনটা টাল খাইয়া গেছে, কিন্তু

তখনই যেন খেয়াল হইল ওর একটা মস্ত কাজ আছে, একটা খুব মস্তবড় কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। দাস্তু চেয়ারে হেলান দিয়া সিগারেটে ধীরে ধীরে টান দিয়া ভিতরে ভিতরে একটা অমানুষিক চেষ্টায় যেন মনটাকে আবার গুছাইয়া লইল, তাহার পর আর কালক্ষেপ না করিয়া মাঝখান থেকেই আরম্ভ করিয়া দিল:

"ধীরেনদা' কখনও হারে নি, কালও জয়ডঙ্কা বাজিয়ে গেল। মহিষ-বাথানের যুগের কথা আমার মনে আছে। ধীরেনদা' দাঁতে দাঁত দিয়ে হাত মুঠিয়ে পড়ে রইল—নুন আমি দোব না। অবশ্য একজন ক্ষীণমুষ্টি বাঙালীর কাছ থেকে নুন ওরা স্বচ্ছন্দেই কেড়ে নিতে পারত, কিন্তু ঘটনাটুকু সরস করে তোলবার জন্যে একজন তার নানা কাজের মিলিটারি ছুরি বের করে বললে—"গান্ধীজীর চেলা তুমি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাব না, ভালো করে ধরে থেকো..." নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে কব্জির ওপর ছুরিটা বসাতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটু বেশি রাগী গোছের একজন মুঠোর পিঠটায় খুব জোরে একঘা লাঠি বসিয়ে দিলে। ধীরেনদা'রই কোট রৈল বজায়, সে ছাড়লে না, তার অবশ হাত থেকে ঝরঝর করে নুনগুলো আপনি পড়ে গেল। সে-হাতটাতে আর সাড় আসেনি। ধীরেনদা' কিন্তু কখনও দুঃখ করেনি তার জন্যে, অবশ বাঁ হাতটার কথা উঠলেই হেসে উঠতো, বলতো—'নিজের কাজ করতে পারলে না বলে আমার সমস্ত শরীর এটাকে একঘরে করেছে, এর ধোপা নাপিত বন্ধ।'

"তারপর এল যুদ্ধ, তার সঙ্গে বাংলার দুর্ভিক্ষ। এতে জেতবার কিছু ছিল না, কেননা যুদ্ধ তো আর ধীরেনদা'র যুদ্ধ নয় যে তার হার-জিতের প্রশ্ন উঠবে; আর দুর্ভিক্ষ জিনিসটাই আগাগোড়া হার, একটা গোটা সভ্যতারই হার; কিন্তু তবু জিতল ধীরেনদা'। ওর সব জিনিসের মধ্যে থেকেই হংসৈর্যথাক্ষীর-মিবাম্বুমধ্যাৎ—জেতার অংশটি বের করে নেবার একটা চমৎকার ক্ষমতা ছিল। যখন গ্রামে—গ্রামান্তরে—সারাদেশে আর একটি তণ্ডুলকণা নেই—যারা গোরু মারলে তারা সমস্ত দেশটাকে যখন লঙ্গরখানা আর ফ্রি-কিচেন করে দাঁড়

করিয়েছে, ধীরেনদা' পণ করে বসলো সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তার মানে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যু বরণ করা।

"ধীরেনদা' গ্রামের জমিদারের আতঙ্ক ছিল, যুদ্ধের সময় ব্যবসাদারদেরও আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু মানতোও ওকে অনেকে, আর বাকি যারা তারা একেবারে দেবতার মতো পূজা করতো। বরঞ্চ দেবতার চেয়েও বেশি, কেননা দেবতার পূজোয় পূজুরীকে ফুলনৈবেদ্যের জোগাড়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়তে হয়, ধীরেনদা'র পূজোয় সে-সবের কোনো বালাই ছিল না। ধীরেনদা' ছিল তাদের কাছে নিরাকার পরম ব্রহ্ম—তার নিজের ক্ষিদে তেষ্টা বলে কিছু নেই, তার কাছে চেয়ে যাও মত পার।

"লঙ্গরখানার সব ব্যবস্থা করে, সেটাকে দাঁড় করিয়ে নিজে যখন সরে দাঁড়াল, সবাই ভিড় করে এসে ওকে ঘিরে ফেলে বললে—'এ ভিক্ষে, আর পাপীর হাতের ভিক্ষে বলে যদি তোমার ঘেন্না তো আমাদের কেন এগিয়ে দিয়েছ? এসো একসঙ্গেই সব উপোস করে মরি, আমরাও আর ওখানে খাব না।'

"ধীরেনদা' হেসে বললে—'দেখ, সব অধিকার সবার থাকে না, বরং আরও ঠিক করে বলতে গেলে—থাকা উচিত নয়। এমন সময় আসে যখন একটা জাতিগত দুঃখ-অপমানের প্রতীক হয়ে একজনের দাঁড়ালেই চলে। যাঁর পায়ের নখের মতন নই আমি, তাঁরই নাম করতে হোল, গান্ধীই হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে থাকুন না, সবারই আমাদের দারিদ্র্যের ঐ নিশানা বইবার দরকার আছে কি? আমায় দেখেছিস কখনও ওরকম নাঙ্গা-ফকির সাজতে?...... একবার ওঁর উপোসের জবাব দিয়ে কতকগুলো লোক আমরণ উপোস করতে গেছল, তাদেরও তিনি ঐ কথা বলেছিলেন—সবার অধিকার নেই, দরকারও নেই। ঘরে ধান যা হোল তাতে সারা জগৎটার পেট ভরে, অথচ আমরাই হ'লাম ভিক্ষাজীবী—তাও কাদের কাছে, না যারা আমাদের নিরন্ন করে চারমহল বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে,—এই অন্যায় আর অপমানের বিরুদ্ধে একজন তো দাঁড়ালাম—তোদের মাকে যদি আলাদা করে ধরিস তো দু'জন। আর তাও

কি না খেয়ে মরবো নাকি ভেবেছিস ? সে বান্দাই নই। আমি খাবো সেই চাল যাতে তোদের অধিকার। এদিকটা ঠিক হোল, এবার আমি চললাম তার জোগাড়ে। জানিস তো, কখনও হার মানিনি, হবেই জোগাড়। তোরা সর্বদাই অনুভব করিস ধীরেনদা' তোদের হয়ে হকের চাল খাচ্ছে।

"করলে জোগাড় ধীরেনদা'। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কি কমিশনার, কি লাট-সাহেবকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল বলা যায় না—ভেঙে আর বললে না সেটা—তবে কোথা থেকে একটা গাধা ভাড়া করে দু'থলে চাল ঝুলিয়ে একদিন উপস্থিত।

"একটু দেরি হয়ে গেল কিন্তু, ঘরে চাল যা ছিল তা দু'দিনের, দেরি হোল সাত দিন, স্বামীর ব্রত মাথায় করে মা সেই দিন সকালে বিদায় নিয়েছিল। একদিক থেকে লক্ষ্মী ঢুকলেন, অন্যদিক থেকে যারা লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে গেছল তারা ঢুকলো।···ধীরেনদা' একবার ভেতরে গিয়ে শূন্য ঘরগুলি দেখে এসে বাইরে দাঁড়ালো। একেবারেই কথা কইতে গলায় যে আটকালো না এমন নয়; গলাটা পরিষ্কার করে হেসে বললে—'তোদের সবার মা ছিল কিনা, হকের চাল যাতে তোরাও রোজ অন্তত একমুঠো করে পেটে দিয়ে আত্মা শুদ্ধ রাখতে পারিস, তার ব্যবস্থা করে গেল। এবার আমি একা আর কত খাব ?"

দাশু চুপ করিল। একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; সাধারণ লোকের বলা নয় তো, অসীম প্রয়াসে মনের লাগাম কষিয়া রাখিতে হইয়াছে; যাহাতে একটু পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে। বলিল—"একটা সিগারেট দাও আরও।"

আমি বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছি—এতটুকু বেচাল নাই কথায়, একটি কথা অবান্তর নয়, অথচ যেই এই গল্পটি শেষ হইবে, মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে; একটা প্রতিভাবান্ যুবকের মানসিক পরিণতিতে মনটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, পাশের লোকটিকে নিচু গলাতে বলিলাম—"এতই পরিষ্কার মাথা, অথচ···"

আমার কথার উপরই একটু আলোচনার-গুঞ্জন উঠিল। প্রত্যেক সভাতেই দু-একজন করিয়া কাষ্ঠ-রসিক থাকে, নিজে যতগুলি সম্ভব দন্ত-বিকাশ করিয়া একটা কিছু বলিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা না করিলে তাহাদের হাঁপ ধরে। সেই রকম গোছের এক ভদ্রলোক যথাপদ্ধতি হাসিয়া, তাহার রসিকতা শুনিবার আমন্ত্রণ স্বরূপ সবার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মজলিসী গলায় বলিল—"আমিও কতবার তাই বলছি দাস্থবাবুকে—অমন পরিষ্কার মাথা, দিব্যি করে সেলুনে দশ-আনা ছ'-আনা চুল ছাঁটিয়ে, মাথার ওপর একখানি এস্‌পার-ওস্‌পার টেরি তুলে দিন্, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া লাগবে; আর…"

দাস্থ সিগারেটসুদ্ধ হাতটা তাহার দিকে বাড়াইয়া বলিল—"থামুন তো, থামুন তো, আগে তাই করেছি, হাওয়াও লাগতো, ছেড়ে দিলাম কেন?…"

স্মৃতির দোরে টোকা মারার মতো করিয়া মাথার-মাঝখানে কয়েকটি তর্জনী-আঘাত করিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল—"পড়েছে মনে—একদিন ধীরেনদা' বলেছিল—বাঃ, সত্য সত্যই ধীরেনদা'র কথা ভুলে যেতে হবে? বারে!—হ্যাঁ, ধীরেনদা' বলেছিল—আমাকেই তো…বললে—দাস্থ, একটি তো মাথা, তাতে টেরিকেই বা রাখবে কোথায়, আর ভারতমাতাকেই বা রাখবে কোথায়? আগে বরং বেছে ঠিক করে নাও…"

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটা উচ্চকিত করিয়া একেবারে পাগলের হাসি হাসিয়া উঠিল।…দাস্থ আবার মনের ব্যাল্যান্স্ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বেশ খানিকটা সময় গেল ঠিক হইতে। আর কিন্তু কেহ উহাকে কিছু বলিল না। দাস্থ এক সময় তেমনই করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল: "কাল ছিল কাপড়ের কিউ।…আচ্ছা, তোমরা কি বল—'কিউ'কে যদি বাংলায় তর্জমা করতে হয় তো 'ঙ' অক্ষরটা দিয়েই করা ঠিক নয়? ওদের দেশের ব্যবস্থাও ভালো, তা ভিন্ন খাবার, তেল, কাপড় কোনদিক দিয়েই অবস্থা এত মারাত্মক নয়; তাই কিউ অক্ষরটায় ওরই মধ্যে যেমন একটি বাঁধুনি আছে, ওদের

সার বেঁধে দাঁড়াবার মধ্যেও সেই রকম একটি বাঁধুনি আছে। আমাদের এখানে পেটের জ্বালায়, লজ্জার চোটে আর সব রকমের অন্ধকারে যা দাঁড়ায় সেটাকে 'ঙ' বলাই ঠিক। গুছিয়ে দাঁড়ানো নয়, একটা জোট পাকানো।

"কাপড় নেবার জন্যে এই 'ঙ'-র মতন জোট পাকিয়ে সবাই দাঁড়াল। এক একজনের এমন অবস্থা যে, ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে না দাঁড়ালে লজ্জা রাখাই দায় হয়ে ওঠে।

"আগের দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে লোকে কাপড় পায়নি। ধীরেনদা' খুব একটা হৈ চৈ তুললে গ্রামে। ধীরেনদা' হৈ চৈ তুললে সেটা গ্রামেই আবদ্ধ থাকতো না। ফলে, কাল সকালেই ঢ্যাঁডরা হোল—কাপড় এসে গেছে, দশটা থেকে বিলি হবে। লোকেরা গিয়ে সকাল থেকেই কিউ হয়ে দাঁড়ালো।

"একটা গুজব উঠল ক্লথ ইনস্পেকটার নিজে এসেছে, তারই হুকুমে ঢ্যাঁডরা দেওয়া হয়েছে, সে নিজে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাপড় বিলি করিয়ে দেবে। দশটা বেজে গেল, এগারোটা বেজে গেল, বারোটা বেজে গেল, দোকানও খোলে না, ক্লথ ইন্স্পেকটারেরও দেখা নেই। চন্ চন্ করে মাথার ওপর রোদ বেড়ে উঠেছে, কয়েকজন তো ভির্মি গেল, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষেরই ঝড়তি-পড়তি সব তো! বাকি যারা তাদের মেজাজ উঠেছে সপ্তমে চড়ে; চেঁচামেচি, গণ্ডগোল বেড়ে উঠতে লাগল; একটু একটু করে একটা রব উঠল—'কাপড় এমনি দেবে না, চালের মত লুকিয়ে ফেলবে'।

"'এমনি-দেবেনা'-র মানে কেড়ে নিতে হবে। কিউএর মাঝে মাঝে ভাঙন ধরতে লাগল, লোক আরও বেড়ে গেল। এক আধটা ঢিল গিয়ে দোকানের বন্ধ দরজায় ওপর পড়তে লাগল। বেলা দুটো পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। একটা কিছু শুরু হয়ে যেত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে একদিক থেকে দারোগা, ক্লথ ইন্স্পেকটার, আর জন আষ্টেক লাঠিওয়ালা পুলিশ, আর তার একটু পরেই অন্যদিক থেকে ধীরেনদা' এসে উপস্থিত হোল।

ধীরেনদা' গ্রামে ছিল না, একটা কাজ থাকে তবে তো! আমাদের মা মারা গিয়ে পর্যন্ত ওর রান্নার পাট ছিল না, যখন যেখানে খুশি একমুঠো খেয়ে নিতো, বলা কওয়া থাকতো না। 'এক মুঠো ভাত বাড়ো রাঙা খুড়ি'—বলে ননীঘোষের বাড়িতে পা দিতেই ননীঘোষের নাতনি রাখালি বললে, 'তুমি গেছলে কোথায় ধীরু কাকা ? উদিকে সায়েদের দোকান যে লুট হ'তে চললো, বোধ হয় এতক্ষণ শুরুই হয়ে গেছে।' ধীরেনদা' জিগ্যেস করলে—'কেন, তোর দাদু কাপড় নিয়ে ফেরেনি ?' রাখালি হেসে বললে—'কাপড়! কাপড় নে' বসে আছে সা' বুড়ো ; শুধু নিয়ে আসতে যা দেরি···'

"ধীরেনদা' সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। যখন পৌছুল তখন দারোগা, ইন্‌স্‌পেকটার সবাই মিলে লোকগুলোকে গুছিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা কিন্তু তখন বেশ একটু শক্ত হয়ে উঠেছে, আরও শক্ত হয়ে পড়েছে পুলিশের ঘাড়ে লম্বা লম্বা লাঠি দেখে ; কতকগুলো লোক ভয় পেয়ে আর কতকগুলো লোক মরিয়া হয়ে যেন গোলমালটা বেড়ে গেছে। এমন সময় ধীরেনদা' এসে উপস্থিত হোল। ওকে দেখেই গোলমালটা আবার একচোট বেড়ে গেল—গোলমাল জিনিসটা এমন যে, ভয়েও বাড়ে, আবার ভরসাতে বাড়ে ; গেল বেড়ে একচোট, তারপর ধীরেনদা' হাত তুলে সবাইকে বুঝিয়ে, সুঝিয়ে থামিয়ে দিলে।

"দোকানটা উদয় সা'য়ের। দোকানের সামনেই খানিকটা রক। বুড়ো উদয় সা' ততক্ষণে দোকান খুলিয়ে দুখানা চেয়ার বের করে দারোগা আর ইন্‌স্‌পেকটারকে বসিয়ে নিজে নিচে একটা কম্বল পাট করে বসেছে। ধীরেনদা' গটগট করে গিয়ে সোজা একেবারে উদয় সা'য়ের সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে—'এতক্ষণ দোকান খোলা হয়নি কেন ? কাপড় বিলি হয়নি কেন ?' দারোগা আস্পর্ধাটা দেখে কাঁপছিল, ছোট ছড়িটা রকে ঠুকে হুঙ্কার করে বললে—'এদিকে আমি যখন রয়েছি, আমার সঙ্গে কথা কও, যা জিগ্যেস করতে হয় আমায় করো।'

"ধীরেনদা' ফিরে দাঁড়ালো, বললে,—'বাঃ, এ প্রশ্নের সঙ্গে তো আপনার কোনো সম্বন্ধ নেই। এ ডিস্ট্রিবিউটার আর কন্জিউমার-এর মধ্যেকার প্রশ্ন। কাল লোকগুলোকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে বিদেয় করেছে। আজ সকালে ঢ্যাডরা পিটোন হয়েছে দশটা থেকে বিলি হবে, এখন দু'টো। ও যদি সাধারণ দোকানদার হোত তা'হলেও বোধ হয় জিগ্যেস করতাম না। ও হচ্ছে সরকার বাহাদুরের পক্ষে স্টকিস্ট,—একটা নির্ধারিত কমিশনের বদলে ও তাঁদের তরফ থেকে কাপড় বিলি করবে।...এ প্রশ্ন তো আপনাকে করবার নয়, আপনি বরং ওর উত্তরটা শুনবেন, তারপর দুজনের প্রশ্ন আর উত্তর নিয়ে বিচার করবেন।'

"শুধু আর একটা হুঙ্কারই হোল—'মুরুব্বিয়ানা থামাও, তুমি একটা পাবলিক ফাংক্শানে বাধা দিচ্ছ, এর জন্যে তোমায় সাজা পেতে হবে।'

"ধীরেনদা' এবার এদিকেই ঘুরে দাঁড়ালো। বললে—'আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন দারোগাবাবু, পাবলিক ফাংক্শানে বাধা দেওয়ার আমার তো ইচ্ছেই নেই বরং চোখের সামনেই দেখলেন আমি লোকগুলোকে গুছিয়ে দিয়ে আরও সাহায্য করছি। আর সাজার ভয় আমায় মিছে দেখাচ্ছেন, আমি এত সাজা নিতে পারি আপনারা তত সাজা দিয়েই উঠতে পারেন না, মানুষই তো ?...আপনি দেখছি আরও চটে উঠেছেন—বেশ, প্রশ্ন তাহলে আপনাকেই করি—উদয় সা'কে কাপড়-বেচবার অনুমতি কে দিয়েছে ? কেন দেওয়া হয়েছে ?'

"উদয় সা সেই জাতের লোক যারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে বলেই লক্ষ লক্ষ লোককে ভাতে মেরেও আবার বাকিদের বিবসন-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবার অধিকার পেয়েছে। ভুঁড়ির ওপর মাঝে মাঝে ডান হাতটি শুধু উল্টে দিচ্ছিল, অর্থাৎ কলিতে আরও কত দেখতে হবে, এযে চাঁদে হাত একেবারে !

দারোগা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল, এক পা এগিয়ে ছড়ি-সুদ্ধ মুঠোটা কোমরে চেপে বল্লে—"তুমি সাহস করছ এ রকম প্রশ্ন আমায় করতে ?"

"ধীরেনদা' একটুও না নড়ে বললে—'আপনাকে করারই প্রশ্ন এটা, করে কি আর এমন সাহসের কাজ করেছি ?···এই একটা লোক যার দোকানের চালে কিছুদিন আগে খড় জুটত না। তেতাল্লিশের লোক-মারা ব্যবসায় এক দোতলা হাঁকড়েছে যার তুলনা সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে আর নেই। আপনি এই এলাকার মালিক, নিশ্চয় উদয় সা'য়ের মতন লোকের ভেতরকার খবর রাখেন, না রাখলেও সাব-রেজেস্টারি আপিসে খবর পেতে পারেন উদয় সা' এখন গ্রামের কতখানি জমির মালিক, আর কতদিনের মধ্যে হয়েছে। অথচ সেই উদয় সা' আবার কাপড়ের লাইসেন্স্ পেলে। উদয় সা' যাদের না খেতে দিয়ে মেরেছে তারা জিগ্যেস করতে আসবে না, কিন্তু যাদের ছ্যাংটা করতে বসেছে তারা জিগ্যেস করবে বৈকি দারোগাবাবু।'

"ওদিকে আবার গোলমালটা বেড়ে যাচ্ছিল, নিজেদের নেতাকে খোদ দারোগার সঙ্গে অমনভাবে কথা কইতে দেখলে যেমন একটা হয়ই,—দারোগা ধীরেনদা'কে ভালোরকম জানতোও, বেশি ঘাঁটালে নিজে যে কাজের চার্জে এসেছে সেটা পণ্ড হয়ে একটা বদনাম হবে মাত্র, ওকে ছেড়ে উদয় সা'কেই অনেকটা ধমকের সুরে বললে—'আপনি বসে কি করছেন সা' মশাই, কাপড় বিলি শুরু করুন।'

"তারপর চেয়ারে এসে বসে বাইরের দিকে ছড়িটা দেখিয়ে বললে—'তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, পাগলের সঙ্গে আলাপ করবার আমার এখন ফুরসৎ নেই।···এত সাহস ত এস-ডি-ও'র কাছে জবাবদিহি চাও গে, সব বিলি বন্দোবস্ত যার হাতে।···নাউ, গেট ডাউন!'

"গেট্ ডাউন অবশ্য ধীরেনদা' সঙ্গে সঙ্গেই করবার পাত্র নয়। যেন হুকুমটা কানেই যায় নি বা কানেই তোলবার মতন নয়, এইভাবে আগেকার মতনই দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললে—'এস-ডি-ও'কে জিগ্যেস করলে তিনি বলবেন ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও, তাঁকে জিগ্যেস করলে তিনি বলবেন আরও ওপরে যাও; আমি জানি আসল কথাটা এক অ্যামেরি সাহেব ভিন্ন কেউ

বলতে পারেন না, কিন্তু একটা সামান্য কথা জিগ্যেস করতে আমার তো অতদূর গেলে চলবে না। আপনি প্রতিভূ হিসেবে আছেন সামনে, আর খুব সম্ভবত, আপনি, ইন্‌স্পেক্টার মশাই, এইরকম কাছাকাছি অফিসারদের সুপারিশেই হয় এই সব ব্যবস্থা, তাই জিগ্যেস করলাম।······আপনি আরও চটছেন, বেশ, সবই যেমন মেনে নিচ্ছি, তেমনি এ ব্যবস্থাও আমরা মেনে নিলাম ; আপাতত কাপড় পাওয়াটাই দরকার, আপনি করুন সেটার বন্দোবস্ত, আমি নেমে দাঁড়াচ্ছি।'

"ধীরেনদা' নেমে ভেতরের দিকে চলে গেল। যেখানে যেখানে গোলমাল হচ্ছিল, দাঁড়িয়ে সেটা ঠিক করে দিলে। বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে কাপড় বিলি হতে লাগল। ওর একেবারে সামনে থাকাটা দারোগার পক্ষে দৃষ্টিকটু হবে বলে পিছনেই রইল। শুধু একবার বিলির জায়গাটায় একটু জটোলা হতে দু'তিন জন চৌকিদার লোকদের মাথার ওপর ছড়ি তুলতেই ধীরেনদা' তাড়াতাড়ি সামনে এসে তাদের একরকম চোখ রাঙিয়েই বললে—'খবরদার, ছড়িবাজি চলবে না চৌকিদার-সায়েব, ওরা সইবে না। ভিক্ষে চাইতে আসে নি, হকের জিনিস নিতে এসেছে !'

"দারোগার চোখে একেবারে আগুন ঠিকরে পড়ল ; কিন্তু কিছু বললে না। উদয় সা' কলির স্পর্ধা দেখে একবার আড়চোখে মোটা গোঁফসুদ্ধ ঠোঁটের একটা কোণ কুঞ্চিত করলে। ধীরেনদা' যেমন এসেছিল, তেমনই ফিরে গেল।

"একটু পরে দারোগার হুকুমে একজন চৌকিদার ভেতরে গিয়ে ধীরেনদা'কে আবার ডেকে নিয়ে এল। দারোগা জিগ্যেস করলে—'তুমি এখানে করছ কি ? এখানে তোমার থাকবার কি দরকার ?'

"ধীরেনদা' বললে—'সে উত্তর তো দিয়েছি, যখন আপনি বললেন পাবলিক ফাংক্‌শানে বাধা দিচ্ছি।'

"দারোগা বললে—'সাহায্য করা ! কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, গবর্নমেণ্টের নিজের শক্তি আছে নিজের কাজ করবার।'

"ধীরেনদা' কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর বললে না ; একটু ভাবলে, তারপর বললে—'কিন্তু সাহায্যটা তো ফালতু কাজ। আমার নিজের কাপড়েরও দরকার যে।'

"দারোগা বললে—'বেশ তাহলে সবার সঙ্গে কিউএ গিয়ে দাঁড়াও, একেবারে শেষে।'

"ওরা যদি আমায় আগে বা মাঝখানে জায়গা দেয় ?'

"আমার আপত্তি নেই।'

"ভুলটা বুঝতে অবশ্য ধীরেনদা'র দেরি হোল না। ও গিয়ে কিউএর একেবারে শেষে গিয়েই দাঁড়াল। কাপড় বিলি চলতে লাগল।

"যখন আধাআধি লোক বাকি আছে উদয় সা' উঠে দারোগার দিকে হাতজোড় করে দাঁড়াল, মুখে শুধু বললে—'এবার হুজুর...'

"কথাটার সব রকম মানেই হয়—আর মাল নেই, বা আজ এই পর্যন্ত থাক, বা হুজুরের এবার হুকুম। কিন্তু হাত বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে একটা তুমুল হল্লা উঠল—'কাপড়!...কাপড়!...হাত বন্ধ করলে চলবে না!... দেরিতে শুরু হয়েচে...'

"উদয় সা' তা ভ্রূক্ষেপ না করে দোকানের দরজা বন্ধ করবার জন্যে যেই এগুবে, অমনি ভিড়ের ভেতর থেকে, গোটাকতক ঢিল সজোরে এসে পড়লো...

"একটা হৈচৈ পড়ে গেল, কিন্তু আর বাড়াবাড়ি হবার আগেই ধীরেনদা' নিজের জায়গা ছেড়ে সামনে গিয়ে ভিড়ের দিকে হাত তুলে দাঁড়াল। তার পর উদয় সা'র দিকে চেয়ে একটু চড়া গলায়ই বললে—'বন্ধ করছেন যে ? কাপড় তো রয়েছে।'

"উদয় সা' দারোগার দিকে চাইলে। দারোগা আবার হুঙ্কার করে উঠল—'বন্ধ হোল আমার হুকুমে, আবার কাল দেওয়া হবে।'

"ধীরেনদা' উত্তর করলে—'কাল তো দূরের কথা, আজ রাত্তিরেই ও কাপড় অদৃশ্য হয়ে যাবে, চালের মতন।

দারোগা আরও এক পর্দা চড়িয়ে বললে—'সে ভাবনা তোমার।' তারপর উদয় সা'র দিকে চেয়ে বললে—'হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাবেন কি মশাই? বন্ধ করুন।'

"পুলিসদের বললে—'তোয়ের থাকবে।'

"স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। ধীরেনদা'ও রুখে উঠল, দারোগার কথাটাই কেড়ে ভিড়ের দিকে চেয়ে বললে—'থাকবে তোয়ের!' তারপর উদয় সা' দোরের পাল্লা দুটো টানবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝখানে পড়ল ঝাঁপিয়ে···"

দাস্থ হঠাৎ চুপ করিয়া গেল, তাহার মন একেবারে কোথা থেকে যেন কোথায় চলিয়া আসিয়াছে। একটু যেন বিস্মিত ভাবে চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া বলিল—"ও! এটা তোমাদের সানডে পার্লামেণ্ট?"

বুঝিলাম দাস্থ বর্ণনা করিতেছিল না, ঘটনাটা যেখানকার সেখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"তারপর ওদিকে কি হোল তাই বলো, ধীরেনদা'র···"

আবার গল্পের খুঁট ধরিতে একটু দেরি হইল দাস্থর, তারপর বলিল—"ও! ধীরেনদা'র?—ধীরেনদা'র শরীরে এদানি আর কিছু ছিল না—বললে হেসে বলত—'কেন, অর্ধাঙ্গ তো ঠিক আছে রে!'···পরশু দিনরাত মেহনৎ গেছে, কাল কিছু খায় নি, তার ওপর দুটো চোট, একটা মাথার ঠিক মাঝখানে, একটা পাঁজরায়···সব শেষ করেই তো এই ফিরছি···"

পার্লামেণ্ট অনেকক্ষণ নীরব রহিল। দেখিলাম কয়েকজনের জানালা দিয়া বাহির দিকে চাহিয়া থাকিবার দরকার হইয়াছে, দু'একজনের চোখে কি পড়িয়াছে এইরূপ ভান করিবারও।

কাষ্ঠরসিক কিন্তু ঠিক আছে—সেইভাবে যতগুলি সম্ভব দাঁত বাহির করিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"তাহলে ধীরেনদা' আপনার শেষ পর্যন্ত হারল, হকের কাপড় আর পেতে হোল না···"

দাস্থ কঠিন প্রয়োজনে যে পাগলামিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে যেন

মুক্তি দিয়া দিল, আবার সেই অসম্ভব উৎকট হাসিতে ঘরটা উচ্চকিত হইয়া উঠিল, দাস্থ হাত বাড়াইয়া বলিল—"লোকটা ক্ষ্যাপা না পাগল! বলে ধীরেনদা' হারবে!···এস্‌-ডি-ও'র স্পেশাল মেসেঞ্জার ছুটে এল সেই রাত্তিরে, সেই দারোগাকে সেই দোকান খুলিয়ে ধীরেনদা'র কাপড় বের করে দিতে হোল!···The greatest war trophy yet···একটা টুকরো না কেটে নিয়ে পারলাম না।"

চৌকির উপর হইতে আনকোরা-নূতন চিতার কাপড়ের টুকরাটা সযত্নে ভাঁজ করিয়া বুকপকেটে পুরিতে পুরিতে পাগল আবার নিজের পথে চলিয়া গেল।

তেজারতি

ভাইপো কোঁদন মাথার পাকা চুল তুলিতে তুলিতে একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "মেজকাকা; একটা কথা বলব, রাখবে ?"

অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াছি; ছুটি করাইয়া লয়, সিনেমা দেখিবার অনুমতি আদায় করিয়া লয়; উত্তর করিলাম, "না-শুনে বলতে পারছি না; কথাটা কি ?"

একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সঙ্কোচটা কাটাইয়া বলিল, "তেমন শক্ত কথা নয়,—বলছিলাম চুল তোলার পয়সা একটু বাড়িয়ে দেবে না ?"

একটা বই পড়িতেছিলাম শুইয়া শুইয়া, সামনের কমার কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলাম, "হঠাৎ ?"

"অনেক দিন থেকে তুলছি তো, হাত পেকে এসেছে।"

এবার আমাকেই একটু চুপ করিয়া যাইতে হইল, কালে কালে এ হইল কি ?—পাকা চুল তোলারও এক্স্‌পার্ট রেট্‌ চায়! মনের ভাবটা প্রকাশ না করিয়া সহজ কণ্ঠেই একটু মৃদু ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "বলি, পয়সারও অভাব বেড়েছে নাকি ?"

বোধ হয় সেকেণ্ড পাঁচ-সাত বিলম্ব হইল, তাহার পর আমার চেয়েও সহজ কণ্ঠে বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, মেজকাকা, একটু দরকার পড়েছে।"

বেশ বোঝা যায় প্রশ্নটা করিয়া ওর যেন মস্ত একটা সুবিধা করিয়া দিয়াছি। প্রশ্ন করিলাম, "দরকারটা কিসের শুনতে পারি ?"

"একটা ব্যাবসা ফাঁদব মনে করেছি।"

কোঁদনের বয়স সাতবছরের কয়েকমাস উপরে, সবে স্কুলে যাইতে আরম্ভ

করিয়াছে। মনের গঠনের দিক দিয়া একটু ভারিক্কে গোছের, মুখে স্কুলের ছেলেদের চেয়ে স্কুলের মাস্টারদের বুলিই বেশি; বাপের পায়ের সামনে নেকড়ার বল রাখিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, কোমরে দুটি হাত, 'শট্'টা ভাল হইলে পিঠ-ঠোকার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া বলে—"গুড্ গুড্, এস্‌সেলেণ্ট !"

চুল তোলায় 'হাত পাকা'র কথায় তেমন বিস্মিত হই নাই, ইডিয়মের কানটা ভালো, কোথাও সংগ্রহ করিয়া বসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু 'ব্যাবসা ফাঁদা'র কথায় বই মুড়িয়া ফিরিয়া চাহিতে হইল। কোঁদন একটুও অপ্রতিভ হইল না, অবিচলিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি আবার পূর্ব্ববৎ শয়ন করিলাম, মনে মনে ব্যাপারটুকু লইয়া একটু চিন্তা করিতেই বুঝিতে পারিলাম রেট বাড়ানোর প্রস্তাবে একটু সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক কোঁদনের, কিন্তু ব্যাবসা ফাঁদার আলোচনা আজকাল যত্র তত্র, এমন কিছু নূতন কথা বলিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না।

প্রসঙ্গটা একটু চালাইবার ইচ্ছা হইল, প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাবসাটা কি তা জানতে পারি ?"

উত্তর পাইলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাইয়া আর কোণঠাসা করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তবে একটু কৌতুক করিবার লোভটা পরিহার করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "তা নাই বল কোঁদন—আর নিয়মও তাই,—ব্যাবসার আসল কথাটা পাঁচ কানে তুলতেও নেই। কিন্তু ব্যাবসা করতে নামছ, হিসেব জিনিসটা বোঝ তো ?"

"কত ধানে কত চাল ?"

ওর বাপের মুখের কথা, সে সাধারণত ব্যাবসার বিরুদ্ধে, ভাইয়েদের সঙ্গে তর্কে এই কথাটা প্রায় ব্যবহার করে, কোঁদন আয়ত্ত করিয়াছে। ঠোঁটের হাসি চাপিতে পারিলাম না, বলিলাম, "হ্যাঁ, বোঝ ?"

"তা বুঝি মেজকাকা, এদিকে অনেক দূর পর্যন্ত গুণতে পারি,—আর…"

বলিলাম, "ঐতেই হবে, আর কি দরকার ? বেশ, তাহলে হিসেব যখন বোঝই কোঁদন, তো অমন বে-হিসেবির মতন কথা বলছ কেন ?"

"কি মেজকাকা ?"

"চুল যখন আমার কম পাকা ছিল, তোমার খুঁজতে মেহনত হত, তুলতে সময় লাগত, তখন পাঁচটাতে এক পয়সা হয়েছে ; এখন কত বেশি, টপ টপ করে চোখ বুজে তুলে যাচ্ছ, সেই এক পয়সাতে দশটা তুলে দেওয়া উচিত নয় তোমার ?"

কোঁদন চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, "অথচ চাইছ তুমি বেশি পয়সা, তার মানে দুটো তুলেই তুমি বোধ হয় এক পয়সা জমা ধরছ। আমিই বরং বলতে পারি—কোঁদন, এক পয়সায় দশটা না হোক, গোটা ছয় দাও তুলে, আরও পাকলে তখন দশটা, তারপর পনেরটা, তারপর কুড়িটা, তারপর……"

কোঁদন বাধা দিয়া বলিল, "পাঁচটাই থাক্ মেজকাকা, ঠাট্টা করছিলুম।"

২

কয়েকদিন আর কোঁদনের ব্যাবসার হালচাল জানি না। বাড়িতে ছেলেমেয়েরা একটার পর একটা অসুখে পড়িয়া গেছে, আরাম করিয়া মাথার পাকা চুল তোলাইব কি, ঘাড়ের উপর মাথাটা আদৌ আছে কিনা সে হিসাবই রাখিতে পারি নাই।

সবে দিনদুয়েক নিশ্বাস লইতে সমর্থ হইয়াছি, গোছগাছ করিয়া লইয়া একটু বই-খাতা লইয়া বসিব, 'বাবু' আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "মেজকাকা, কোঁদনের অসুখ করেছে।"

সত্য কথা বলিতে কি, মনটা খিঁচড়াইয়া গেল, বলিলাম, "খুশি হলাম ; পই পই করে বারণ করছি, খারাপ সময় যাচ্ছে, রোদে হাওয়ায় বেড়াসনে ওরকম ছুটোছুটি করে, তা শুনবে কথা ?—ভুগুক, না ভুগলে চাঁক্ হবে না। যাও।"

বয়সে এই দুটিতে সবচেয়ে কাছাকাছি, সেইজন্য অত্যন্ত বেশি ভাব এবং অত্যন্ত বেশি আড়াআড়ি। এখন নিশ্চয় ভাবের পালা চলিতেছে, বাবু মুখটি নিচু করিয়া বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগের ঝোঁকেই আবার কাজে মন দিয়াছিলাম, ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাছে কে আছে ?"

"কেউ নেই।"

"কেন, ওর মা ?"

"ঘুমচ্ছেন, মেজকাকা।"

রাগে গা'টা আরও জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, "ঘুমচ্ছেন ?···বেশ, ঘুমতে দাও নিশ্চিন্দি হয়ে। এই করেই তো হচ্ছে এই সব,—মায়েরা ঘুমোন, ছেলেরা দুপুর রোদ্দুরে হুটোপুটি করে ফিরুক, জল খাক্ ঢক্ ঢক্ করে।··· যাও, আমায় আর জ্বালাতন কোরো না।"

আবার টেবিলের দিকে ঘুরিয়া বসিলাম।

বাবু মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। যখন বাইরের উঠানটা পার হইয়া গেছে, ডাক দিলাম, "এদিকে আয়।"

কাছে আসিলে প্রশ্ন করিলাম, "বলেছিস ওর মাকে ?"

"না।"

"বলিস নি তো জানবেন কি করে শুনি ? যা, তাঁকে বল্ উঠে জ্বরটা দেখতে। আমায় বলে যা কত জ্বর আছে।"

বাবু ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কাজে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম, প্রায় আধঘণ্টাটাক পরে খেয়াল হইল বাবু খবরটা দিয়া যায় নাই ; চেয়ারটা ঠেলিয়া উঠিতে যাইব, দুয়ারের আড়ালে একটি কচি মুখ সট্ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ডাকিলাম, "কে ? এদিকে আয়।"

তরুণ বাহির হইয়া মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, যখন ঝগড়া না থাকে সংবাদবাহকের কাজ করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?—দোরের আড়াল থেকে ওরকম উঁকিঝুঁকি মারছিলি যে?"

"বাবু পাঠিয়েছে।"

"তিনি বুঝি নিজে আসতে পারলেন না? জ্বর কত কোঁদনের?"

"একশ পাঁচ।"

"একশ পাঁচ কি রে! বলিস কি!"

তরুণ নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"ছটফট করছে খুব?"

তরুণ নির্বিকার ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

"ওর মাকে মাথায় জলপটি দিতে বল্‌গে। আমি এক্ষুনি আসছি।" বরফ আনিবার জন্য চাকরটাকে উঠাইয়া ঘরে আসিয়া টাকা লইবার জন্য ড্রয়ারটা খুলিয়াছি, পিছনে চাপা কণ্ঠের আওয়াজ কানে গেল—"মেজকাকা।"

ঘুরিয়া দেখি অনিল; তরুণের সমবয়সী, বাড়ির শিশু-রাজনীতিক্ষেত্রে জায়গাটাও অনুরূপ; প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

অনিল বাহিরের উঠানের ওদিকে বাড়ির দোরগোড়ায় একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইল, তাহার পর আরও একটু মগ্ন স্বরে বলিল, "কোঁদনের অসুখ তো করে নি।"

"অসুখ করে নি! তবে যে তরুণ বলে গেল একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। একেবারেই কিছু হয় নি?"

অনিল আর একবার দরজার পানে দৃষ্টিপাত করিল, আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে বাবুর মুখের খানিকটা নজরে পড়িয়া গেল। অবশ্য নিমেষে অন্তর্হিতও হইল সেটুকু, কিন্তু অনিল আর কিছু উত্তর দিল না, শুধু মাথাটা নিচু করিয়া আড়চোখে মাঝে মাঝে ওদিককার দরজার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মাথা গুলাইয়া আসিতেছে। ওদের পলিটিক্‌স্‌ লইয়া মধ্যে মধ্যে এই

রকম বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। দুপুরবেলা সবাই আপিসে থাকে, মেয়েরা ঘুমায়, যতই বাঁচাইয়া চলিতে চাই না কেন কূটনীতির ধকলটা আমারই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, আর এই সময়ই চারিদিক নিষ্কণ্টক দেখিয়া বাড়িয়াও যায় ওদের আদান-প্রদান, সন্ধি-বিগ্রহ, নালিশ-ফরিয়াদ।···ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অসুখে পড়াটা এদের অনেক সময় একটা পোয়া-বারো—পড়ার হাঙ্গাম নাই, নেবু-বেদানা আছে, যাদের মুখে অষ্টপ্রহর খিঁচুনি, গালমন্দ, তাদের কাছে একটু 'আহা-উহু'ও পাওয়া যায়—তাই জ্বরে পড়িলে ওদের জগতে প্রতিপক্ষের হয় হিংসার উদ্রেক—হয়তো অনিলের সঙ্গে এখন আড়ির পালা চলিতেছে···

কিন্তু একশ পাঁচ ডিগ্রির সবটুকুই কি ভুয়ো? "আয় তো দেখি।" বলিয়া ভিতরবাড়ির দিকে পা বাড়াইলাম।

বাড়িতে সবাই ঘুমাইতেছে; অনিল অগ্রসর হইয়া আমায় দোতলার মাঝের ঘরের সামনে পর্যন্ত লইয়া গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গিয়া দেখি মেয়েদের কেহই নাই, চৌকির মাঝখানে কোঁদন শুইয়া আছে, কাঁথা-চাদর যতগুলা সংগ্রহ হইয়াছে সব তাহার উপর চাপানো, মুখটা পর্যন্ত ঢাকা, মাথার কাছে বাবু এবং পায়ের কাছে তরুণ বসিয়া আছে। দুজনেই খুব বিমর্ষ, আমি গিয়া দাঁড়াইতে একবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল।

একটা কোনো গভীর ষড়যন্ত্র যে চলিতেছে এটুকু বুঝিতে পারিয়াও আমি একবার কাঁথার ভিতর হাত দিয়া কপালটা আর বুকটা দেখিলাম, ঘামে ভিজিয়া টেম্পারেচার প্রায় পঁচানব্বইয়ে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাড়ীটাও টিপিলাম একবার, বেশ চঞ্চল, তবে সেটা যে আমি ধরার জন্যই সেটুকু বুঝিতে বাকি রহিল না। ব্যাপারখানা কি?—এর তল দেখিতে হইবে তো! অনেক কষ্টে কোনরকমে হাসিটা চাপিয়া চক্ষু দুইটা কড়িকাঠ-সংলগ্ন করিলাম, মুখে যতটা সম্ভব চিন্তার ভাব ফুটাইয়া একটু মাথা দুলাইয়া বলিলাম, "হুঁ···।"

তাহার পর বাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নামাইয়া বলিলাম, "কে বললে একশ পাঁচ ?—কে দেখেছে ?"

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, চঞ্চল স্বভাব, উৎসাহের মুখে চোখ দুইটা যেন জ্বলিতে থাকে ; থার্মোমিটার নাই, আমার আদেশমতো কোঁদনের মাকেও যে ডাকে নাই সব ভুলিয়া একটু গলাটা তুলিয়া বলিল, "আমি মেজকাকা।"

বলিলাম, "একশ পাঁচ, মোটে ? একশ পনেরর এক ডিগ্রিও কম নয়। যখন জানিস না হুট্ করে বলতে যাস কেন অমন করে ? মোটে একশ পাঁচের ওষুধ খেয়ে এক্ষুনি যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত, তখন ?"

এতবড় সফলতা বাবু আশা করে নাই, ভিতরের উল্লাসে চোখ দুইটা চক্‌চক করিয়া উঠিল, উহারই মধ্যে যথাসাধ্য চিন্তার ভাব ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হবে মেজকাকা তাহলে ?"

বলিলাম, "ওষুধ খেতে হবে, কুইনিন।"

উৎসাহে তরুণের মুখও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যবস্থা দেখিয়া দুজনের মুখই একেবারে যেন ছাইপানা হইয়া গেল, রোগীও কাঁথার নিচে আড়ামোড়া দিয়া উঠিল।

বলিলাম, "কিন্তু কথা হচ্ছে, একশ পনের ডিগ্রি জ্বরের মতন অত তেতো কুইনিন পাওয়াই যায় বা কোথায় ?"

কোঁদন মুখের ঢাকাটা খুলিয়া ফেলিল, ঘামে যেন সমস্ত মুখটা সিদ্ধ হইয়া রাঙা হইয়া গেছে. চুলগুলা পর্যন্ত গেছে ভিজিয়া। "ওকি, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে !" বলিয়া কাঁথাটা টানিয়া দিতে যাইতেছিলাম, কোঁদন হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "অত জ্বর হবে না মেজকাকা।"

বলিলাম "এক ডিগ্রিও কম নয়। তুই তো বলবিই, ভাত খাওয়া বন্ধ হবে কিনা।"

কুইনিনের উপর ভাত বন্ধ—এত সব হিসাব করিয়া দেখে নাই, কোঁদনের যেন ঘামের বন্যা নামিল, বাবুর আর তরুণের মুখ গেছে আরও শুকাইয়া,

তিনজনেই একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল; অকূলে পড়িয়াছে। ঢাকাটা আমি দিলাম টানিয়া। তাহার পর "এখন কুইনিনটা পাওয়া যায় কোথায় ?" বলিয়া চিন্তিতভাবে দৃষ্টি আবার কড়িকাঠে তুলিলাম।

কাঁথার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "মেজকাকা !"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"



উত্তরে জড়াইয়া কি বলিল ভালো বোঝা গেল না, কানটা সরাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলাম. "কি বললি ?"

"বলছিলাম—বেশি তেতো কুইনিন খেলে বেশি টাকা পাব তো ?"

"টাকা! এর মধ্যে টাকার কথা আসে কোথা থেকে? অসুখ হয়েছে, ওষুধ খাবি, এই তো সোজা বুঝি—টাকা তো এমনি ডাক্তারে-ওষুধে কত বেরিয়ে যাবে আমাদের।"

বেচারিরা মতলব আঁটে খুব বড় বড় কিন্তু কখনও শেষ রক্ষা করিতে পারে না; সব প্ল্যান কাঁচিয়া গেল, তাহার উপর উল্টা উৎপত্তি, বাবু যেন মরিয়া হইয়াই বলিল, "মেজকাকা, একটা কথা বলব ?"

উত্তর করিলাম, "বলো।"

দুইবার ঢোঁক গিলিল, তাহার পর বলিল, "কোঁদন বলছিল—এ-অসুখে ডাক্তারও ডাকতে হবে না, ওষুধও কিনতে হবে না, টাকা পেলেই ওর ভালো হয়ে যাবে।...কটা টাকা রে কোঁদন ?"

কানটা আগাইয়া লইয়া গেল। আমিও কানটা কাত করিয়া দিয়াছি, ফিস্‌ফিসানির মধ্যে দিয়া শুনিলাম, "দুটো"

বাবু উকিল ভালো দাঁড়াইবে, কেস্‌টা যে খুব মজবুত নয় বুঝিয়াছে, বলিল, "বলছে—একটাকা হলেই হবে মেজকাকা।"

আমি গলাটা পর্যন্ত কড়িকাঠের দিকে উঁচু করিয়া দিলাম, অন্যথা হাসি লুকানো কঠিন হইয়া পড়িত।

৩

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হইল, কোঁদনের পুঁজিসংগ্রহের ফিকির। অসুখে পড়িলেই ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু কিছু জমা হয়, ঔষধ আছে, আবদার আছে, আবার নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াও দেয় এক-আধজন—বেশ একটা রোজগারের পথ। পাকা চুলের দিক দিয়া প্রয়োজনমতো অর্থ সঞ্চয় হইয়া না ওঠায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কোম্পানি যে গঠন হইয়াছে তাহার মধ্যে বাবু এবং তরুণও যে শেয়ারহোল্ডার এটাও স্পষ্ট; অনিল

প্রতিদ্বন্দ্বী, ভাংচি দিয়া পুঁজির বাজার নষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে। দলে আর কে আছে জানি না, তবে ওদের গণ্ডির মধ্যে ব্যাপারটা যে একটা সাড়া জাগাইয়াছে এটা বেশ বোঝা যায়,—কিন্তু ব্যাবসাটা কি?

কয়েকদিন একটা স্মিত কৌতুক জাগিয়া রহিল মনে, তাহার পর ব্যাপারটা খেয়াল থেকে নামিয়া গেছে এমন সময় একদিন একটি দৃশ্যে হঠাৎ একটু সচকিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের দুইটা বাড়ির মাঝখানে একফালি জমি আছে, দুইদিকে দুই বাড়ির দেয়াল। দুপুরবেলা, গন্‌গনে রোদ, দুইটি বাড়িই নিস্তব্ধ, আমার ঘর থেকে হঠাৎ নজর গেল—কোঁদন আর ও-বাড়ির ভুলুর মধ্যে কি একটা গভীর পরামর্শ চলিতেছে, কোঁদন যেমন ওর বুকের মাঝখানে চারিটা আঙুল চাপিয়া আছে তাহাতে মনে হয় কোনো একটা ব্যাপারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাজি করাইবার চেষ্টা করিতেছে যেন।

আমি আগাইয়া গিয়া একটা আড়াল দেখিয়া দাঁড়াইব ভাবিতেছি এমন সময় কোঁদন ঘুরিয়া এদিকে পা বাড়াইল, মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল একটা কিছু ঠিক হইয়াছে, দু পা আসিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এক্ষুনি আসছি, দাঁড়িয়ে থাকবি।"

ছেলেটি বড় নিরীহ গোছের, বয়সেও কম এদের চেয়ে, মাথাটা কাত করিয়া জানাইল, থাকিবে দাঁড়াইয়া। কৌতূহলটা গেল বাড়িয়া। কোঁদন আসিয়া আমাদের বাড়ির একেবারে উল্টা দিকে বাগানের দিকটায় যাইতেছে দেখিয়া, আমি আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলাম, রান্নাঘরে দাঁড়াইলে ওদিকটা দেখা যায়, জানালাটা সামান্য একটু খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কোঁদন ততক্ষণে পৌঁছিয়া গেছে। আমাদের প্রতিবেশী রামকিষণের বাড়ির কানাচে দাঁড়াইয়া গলা-খাঁকারি দিতেছে। বিস্ময়ে আমি একেবারে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া গেছি; রামকিষণ বেচারি গরিব লোক, জেলাবোর্ডের রাস্তা আগলায়, ওর বাড়িতে কোঁদনের কি দরকার পড়িল হঠাৎ, সে-দরকারের সঙ্গে ভুলুরই বা সম্বন্ধ কি এমন!

কয়েকবার গলা-খাঁকারি দিতেই রামকিষণের ছোট নাতিটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পেয়ারাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "এনেছ ?"

কোঁদন মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ ।"

"দাও দেখি।"

"তুই বের কর্ আগে।" নিজে হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত সাঁদ করাইয়া দিল।

ছোঁড়াটা নিজের কোমরের কাপড়ের মধ্যে হইতে একটা ছোট্ট কাঠিতে জড়ানো মান্‌ঝা-করা গোলাপী রঙের ঘুড়ির স্থতা বাহির করিয়া কোঁদনের দিকে বাডাইয়া ধরিল, কোঁদনও পকেট থেকে একটা আটআনি বাহির করিল, লেন-দেন হইল। ছোঁড়াটা প্রশ্ন করিল, "আরও চাই খোঁকাবাবু? বল তো জোগাড় করি।"

কোঁদন উত্তর করিল,—"কর্ জোগাড, তবে বড্ড দাম, কমাতে হবে।"

যখন ফিরিল সমস্ত মুখটা দেখিলাম—কী সস্তাই যেন মারিয়াছে, চোখে মুখে উল্লাস আর ধরে না।

দুই বাড়ির সেই গলিটার দিকে চলিল, আমিও আগের চেয়ে আরও কাছে একটা আড়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম।

ভুলু সেইখানে উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোঁদন আসিয়া বলিল, "বের কর্।"

দুইজনেই হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দিল। ভুলু বাহির করিল একটা টাকা, কোঁদন সেই ঘুড়ির স্থতার বাণ্ডিলটা ; নিঃশব্দে হাতফের হইল।

গোলাপী বাণ্ডিলটুকুর দিকে চাহিয়া ভুলুর ঠোঁটে সে যে কী হাসি ফুটিল!—কোঁদন যেন আকাশের চাঁদ ধরিয়া আনিয়া দিয়াছে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া আশ আর মেটে না। কোঁদন উৎসাহ দিয়া বলিল, "বড্ড দাম, তুই ভাই তাই সস্তায় ছেড়ে দিলুম। আরও পাবি, যা টাকা জোগাড় কর্‌গে।"

সুযোগ

ও. টি. আর'এর একটা জংশন স্টেশন, আমাদের গাড়িটা এইখান হইতেই ছাড়িবে।

ভিড়ের আর কোন হিসাব নাই ; গাড়িতে ভিড়, পা'দানে ভিড়, ছাতের উপর পর্যন্ত ভিড় জমিয়া উঠিতেছে।

চেঁচামেচি গালাগালির চোটে কান পাতা যায় না ; আমাদের পাশেই মেয়েদের ইণ্টারক্লাস—সেখানকার অবস্থা একেবারে অবর্ণনীয়, কী যে হইতেছে এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফল যে কী হইবে কোন আন্দাজই পাওয়া যাইতেছে না—ইতর-ভদ্র সবাই রণচণ্ডী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছি, মিনিট দুয়েক যে সময় আছে সেটুকুও যেন একটা যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। সহসা, যাহা ভয় করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিয়া গেল, ঐ গাড়ির মধ্যেই সব ছাপাইয়া এক তুমুল কলরব উঠিল—"অজ্ঞান হয়ে গেছে। …দাঁতকপাটি !…মরে গেছে !…জন দুই স্ত্রীলোক গলা বাড়াইয়া চার-পাঁচটা নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, একজন নামিয়া পড়িয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।

আমাদের খান তিনেক গাড়ি পরে একটা থার্ড ক্লাস হইতে দুইজন লোক ছুটিয়া আসিয়া মেয়েদের গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং একটা আন্দাজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসরের অচৈতন্য স্ত্রীলোককে হাতা-হাতি করিয়া বাহির করিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর শেডের নিচে শোওয়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তিন চার শত লোক জায়গাটাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নানা কণ্ঠে নানা রকম মন্তব্য উঠিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মের কলরব গাড়ির কলরবটাকে একেবারে ডুবাইয়া দিল। একদল বলিল—মরে গেছে ; একদল বলিল—না, জ্যান্ত আছে এখনও ;

একদল বলিল—মুখে জলের ঝাপটা মারো ; একদল বলিল—আগে হাওয়া ছেড়ে সরে দাঁড়াও। অবশ্য হাওয়া ছাড়িবার জন্য কেহই সরিয়া দাঁড়াইল না—যাহারা চেঁচাইল তাহারাও নয়। জল জনকতক আনিতে ছুটিল, জন দু'য়েক আনিয়াও হাজির করিল, কিন্তু কেহই তাহাদের পথ ছাড়িয়া ভিতরে যাইতে দিল না।

আমি প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকের বেঞ্চটায় একেবারে কোণটিতে বসিয়া আছি, নামিবার উপায় নাই, নামিয়া কোন ফলও নাই। ওদিক থেকে একটি খদ্দরধারী মাঝবয়সী ভদ্রলোক চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে তো যাইতে পারিলেনই না, এখন উপরে উঠিয়া আসিতেও পারিতেছেন না। তিনি নামার জন্য দরজাটা কোন রকমে একটু খুলিতেই এই চাপ-ভিড়ের মধ্যেও কি করিয়া আরও পাঁচ-ছয় জন লোক ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ভিড় জট-পাকাইয়া দরজার কাছটা এখন ঠিক বেউড় বাঁশের ঝাড়ের মতো হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোক খদ্দরের ধর্ম ভুলিয়া ক্রমাগত দরজাটায় লাথি হাঁকড়াইতেছেন—উপযুক্ত ভাষারও সহযোগ আছে—ওদিকে ভিতর থেকে সবাই দরজাটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে,—শেষে যে পাঁচ-ছয় জন উঠিয়াছিল, তাহারাই অগ্রণী, উপযুক্ত জবাবও দিতেছে।

এমৎ অবস্থায় জায়গা ছাড়িয়া ফল কি ? অবাক হইয়া কাণ্ডটি দেখিতেছি।

ভিড় জমিয়া উঠিতেছে, ভিতরে স্ত্রীলোকটির অবস্থা যে কি ঠিকমতো রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে না। তবে মারা যায় নাই, একটু জল বোধহয় ওদিক দিয়া কোন রকমে পৌঁছিয়াছে। "চোক খুলেছে ! চোক খুলেছে !"—বলিয়া ভিতর থেকে একটা কলরব উঠিল। তখুনি কিন্তু সেটা আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল, আবার নিশ্চয়ই অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, এ-অবস্থার মধ্যে চোখ সে খুলিয়াছিল এইটেই আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকিতেছে।

ওদিকে সেই খদ্দরধারী ভদ্রলোক অবিশ্রান্ত লাথি চালাইয়া যাইতেছেন, অনেক সহযোগী জুটিয়া গেছে তাঁহার, দরজাটা একটু ফাঁক হইলে

সমস্ত দলটা ঢুকিবে। ভদ্রলোক বলিতেছেন—"আমার ট্রাঙ্ক বেডিং সব ভেতরে।"

ভিতর হইতে প্রশ্ন হইতেছে—"কোনটে দেখিয়ে দিন্ আমরা বের করে দিচ্ছি।"

একজন বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা নজর রাখব, কোন্ স্টেশনে নামবেন ?"

এ-ধরণের সহানুভূতির ওপর গালাগালিই বাহির হয়, তাহারই ঝড় বহিল আবার।

আমার পাশে দুইজন ভদ্রলোকের মধ্যে প্রবল বচসা লাগিয়া গেছে, একজন গাড়ির উপর, একজন নিচে, কখন আরম্ভ হইয়াছে বচসাটি লক্ষ্য করি নাই অত—ঠিক লক্ষ্য করিয়া কোন জিনিসই শুনিবার মতো অবস্থা নয়। এখন তাঁহারা মাঝ পথে, নিচের ভদ্রলোক বলিতেছেন, একোনাইটের সিম্প্‌টম, উপরের ভদ্রলোক বলিতেছেন, ক্যামোমিলা। নিচের ভদ্রলোক বলিতেছেন—"আপনি হোমিওপ্যাথির জানেন কি ?" উপরের ভদ্রলোক বলিতেছেন—"যে এরকম কেসে একোনাইট দিতে বলে তাকে হাতে ধ'রে শেখাতে পারি।"—'হাতে ধ'রে' কথাদুটার কাছে এমন আটকাইয়া গেল দুই বার, বেশ বোঝা গেল 'কানে ধ'রে' বলাই উদ্দেশ্য ছিল। এ ঝগড়াটাও জমিয়া উঠিতেছে দেখিয়া এখানেও একটি ছোট্ট দল জুটিয়া গেল, যাহারা দরজায় ধাক্কা দিতেছিল তাহাদের মধ্যে থেকেও দু'একজন দল ভাঙিয়া এদিকে চলিয়া আসিল। একজন আমার বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কেন ঠিক বলিতে পারি না,—বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, অস্বাভাবিক রকম মোটা একজোড়া গোঁফ, নিজে এদিকে লম্বা, রোগা, চোখ দুইটি তীক্ষ্ণ; বাদ-প্রতিবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন ভেতরে ভেতরে ভাবিতেছিল, বচসার মধ্যে বিদ্রূপের অংশ আরও একটু বেশি আর উগ্র হইয়া উঠিতে দুইপা আগাইয়া আসিয়া উপরের হোমিওপ্যাথিককে বলিল—"তা ডাক্তারবাবু, আপনি না হয়

নেমে এসে একবার দেখুন না বুড়িটাকে, ওপর থেকে সিম্প্‌টম্ তো বুঝতে পারবেন না। মিছিমিছি ঝগড়া করে কি হবে ?"

ডাক্তার উগ্র দৃষ্টি তাহার পানে ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কে ?"

"আমি কেউ নয় ; একজন মুসাফির।"

"উনি দেখেছেন বুড়িটাকে ?—যাঁর হয়ে আপনি ওকালতি করতে এসেছেন ?—তার মানে, আমি নামতে যাই আর আপনারা হুড়মুড়িয়ে উঠুন,—এই তো মতলবটা ?...ওঁকে জিগ্যেস করুন না, উনি দেখেছেন ?"

উদ্দেশ্যটা ধরা পড়ার জন্য লোকটা একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—"অমনি উঠতে যাবার কথা হোল ? হুঁঃ !"

তাহার পর ওপরের ডাক্তারের কাছে দাবড়ানি খাইয়া নিচের ডাক্তারকে একটু খোসামোদের সুরেই প্রশ্ন করিল—"আপনি দেখেছেন ডাক্তার সাহেব ?"

ডাক্তার যেন প্রশ্নটার জন্য তৈয়ার হইয়াই ছিল, একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল—"কে আপনি ?—হু আর ইউ ?"

"রুগী না দেখেই আপনারা ওষুধ নিয়ে তর্ক করছিলেন, তাই বলছি..."

"আলবৎ তর্ক করছি, ডাক্তারে ডাক্তারে তর্ক হচ্ছে এর মধ্যে আপনি পড়েন কেন ? কি বোঝেন আপনি হোমিওপ্যাথির ?"

উপরের ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিল—"ঐ বললাম—আসল মতলবটা ওঁর আমি ধরেছি, আমি নাবি আর উনি উঠে জায়গাটি দখল করে বসুন।" দুই ডাক্তারেই একটু হাসিল।

ওদিকে সেই খদ্দরধারী ভদ্রলোক দরজার উপর দিয়া কখন পা-দুইটা গলাইয়া দিয়া দুপাশের চৌকাঠ দুইটা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ; বাহিরের লোকদের সঙ্গে বোধ হয় একটা রফা করিয়াছে ভিতরে গিয়া দরজা খুলিতে সাহায্য করিবে, তাহারা বাহির হইতে প্রাণপণে ঠেলিতেছে, ওদিকে ভিতর হইতে কয়েকজনে ঠেলিয়া আছে।

অবস্থাটা বড় সঙ্কটজনক বোধ হইতেছে। নিচে একটা লোক একটু

তফাতে দাঁড়াইয়া এক একবার ঘাড় বাঁকাইয়া ভিতরের দিকে দেখিতেছে আর উৎসাহ দিতেছে—"আর একটু জোর দাও—আর একটুখানি, তাহলেই ব্যস। বাঃ জোয়ান, এই হয়ে এলো বলে—আর একটু জোর···" কুলির মেটেরা যেমন ভাবে কড়ি-বরগা সাঁদ করায় ঘরের মধ্যে, অনেকটা সেই রকম।

অচৈতন্য স্ত্রীলোকটির চারিদিকে ভিড় যেন আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিতেছে—সেই রব—"হাওয়া ছেড়ে দাঁড়াও—জল, আরও জল—বরফ—বরফ পাওয়া যায় না ইষ্টিশনে?"···কে কাহাকে যে বলিতেছে কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

একটা চা-ওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল—এক হাতে কাঠের হ্যাণ্ডেল দিয়া ঝোলানো একটা ছোট দেবদারুর বাক্স, মাটির পেয়ালায় ভরা, আর এক হাতে একটা রাম-কেটলি,—গলার শির ফুলাইয়া বলিতেছে—"আসুন, গরম গরম চা, এক পেয়ালা গরম চা চড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠুন, লড়বার তাকৎ এনে দেবে। আসুন, যদি গরমে বে-হোস হয়ে লাটফরমে পড়ে থাকতে না চান, এক কাপ খেয়ে নিন—গরমিতে গরম চা—গরমিতে গরম চা!—চলে আসুন!···"

—একটা ছোঁড়া আছে; এত বিক্রি, দুই জনে জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

"ঠাণ্ডা সরবৎ! ঠা-ণ্ডা সরবৎ!"

ছোট-ছোট চারিটা চাকা বসানো একটা বাক্স ঠেলিয়া একটা লোক আসিয়া গরম চায়ের একটু তফাতে দাঁড়াইল। থাপি দিয়া কাপড়ে-মোড়া বরফ চুর করিতেছে আর চেঁচাইতেছে—"চলে আসুন, বরফদার লক্ষ্ণৌকা ঠাণ্ডা সরবৎ! আর গরমে বে-হোস হবার দরকার নেই, চলে আসুন! ঠাণ্ডা—বরফদার!···আমার সরবৎ না খেয়ে গাড়িতে উঠলে, নেমে এসে লাটফরমে ঐরকম ক'রে বুড়ির মতন শুতে হবে—নিজের চোখে দেখে নিন অবস্থাটা!···"

লোকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। চা-ওয়ালার গলার শির আরও উঠিয়াছে ফুলিয়া।

"লাহোরের ধরমরাজ বৈদের 'মোতি ভসম্' গোলি!—মিরগি, বে-হোসি'র অব্যর্থ দাবাই, এই বুড়িকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যক্ষ ফল দেখুন—দাঁত কন্‌কনানি, কান কন্‌কনানি, বুক ধড়ফড়ানি, কোমরে ব্যথা—এক ছটাক ছাগলের দুধে গুলে খেয়ে ফেলুন, বিলকুল সাফ্!···বদ হজমি, পেটফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর ওঠা, অরুচি—এক ছটাক গোরুর দুধে গুলে খেয়ে ফেলুন—বিলকুল সাফ্।....চোখের ছানি, চোখ-ওঠা, চোখে জল পড়া, রাত-অন্ধি—আধ ছটাক মধুর সঙ্গে মিশিয়ে শোবার আগে লাগিয়ে দিন—বিলকুল সাফ্!···ছেলেদের দাঁত-ওঠা, শর্দি, হুপিং কফ্—আধখানা গোলি মায়ের দুধের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দিন, বিলকুল সাফ্!···না-তাকৃতি, পিলৃহি, কালাজ্বর···এক ছটাক···"—দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পরিতেছে না।

একটা পাখা-ওয়ালা একটু আগে দু'আনা করিয়া পাখা ফিরি করিয়া বেড়াইতেছিল, মিরগি 'বে-হোসি'র ভয় দেখাইয়া প্রত্যেকটি পাখা পাঁচ-আনা করিয়া বেচিয়া ফেলিল। জমা খালি করিয়া একটু ব্যস্তভাবেই ভিড়ের মধ্যে একটু মাথা গলাইয়া দু'একজনকে কি জিজ্ঞাসা করিল, তাহার পর একটু ছুটিতে ছুটিতেই প্ল্যাটফর্ম্ ছাড়িয়া ওভারব্রিজ হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল, নিশ্চয় আশা পাইয়াছে, আরও পাখা আনিতে যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে ভিড়ের চারিদিকে একটি দস্তুরমতো বাজার বসিয়া গেল—গোল হইয়া,—চায়ের পরে সরবৎ, তাহার পর চীনা বাদাম, তাহার পর কাবুলী ম্যাওয়া, তাহার পর ঝালচানা; ওদিকটা নজর যাইতেছে না, তবে আওয়াজ শুনিতেছি—'চলে আসুন, টাটকা পুরি জিলিপি; খালি পেটে 'বে-হোস' হয়ে পড়বেন!···রামদানাকা লাড্ডু!—হালকা পুষ্টাই খোরাক!—গরমে ভারী জিনিসে পেট বোঝাই করবেন না—আসুন!···" বুড়িটার সঠিক খবর পাওয়া আরও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তবে বাঁচিয়া আছে।

সবটা অদ্ভুত ঠেকিতেছিল—একটা স্ত্রীলোক মরিতে বসিয়াছে, নির্বিকার ভাবে যে-যাহার কাজ গুছাইয়া যাইতেছে, যতটা বুঝিতেছি স্ত্রীলোকটা যতটা ধুঁকিয়া মরে, ততই যেন ইহাদের লাভ। স্ত্রীলোকটার আচরণও অদ্ভুত বোধ হইতেছিল। যেমন অবস্থা ওকে বাঁচিতে দিবে না, মরুকই না হয় তাড়াতাড়ি··· এদিকে আমাদের প্রাণ যায়। গোড়ায় তিন চারবার গাড়িটা চলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, অর্ধেক যাত্রী নিচে তামাসা দেখিতে নামিয়াছে, তিন চারবারই তাহাদের লোকেরা চেন টানিয়া গাড়ি থামাইয়া দিল। বিশেষ দরকারী কাজ আমার, তা ভিন্ন অবস্থাটাও অসহ্য, ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছি—প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হইয়া গেল। সত্যই কেমন একটা হৃদয়হীন বিরক্তি আসিয়া গেছে—সবার মনে; গাড়ির মধ্যে একটি বাঙালী বৃদ্ধ একটা ট্রাঙ্কের উপর কোনরকমে গুটাইয়া সুটাইয়া বসিয়া ছিলেন, বিরক্তি আর চাপিতে না পারিয়া বলিয়াই উঠিলেন—"বুড়িটাও আর মিছিমিছি জ্বালায় কেন? দেখছিস বাঁচতে দেবে না তোকে, ওদের তামাসা ভেঙে দিয়ে সরে পড়্ না বাপু!···"

এমন সময় হঠাৎ কলরব উঠিল—"বেঁচেছে···বেঁচে গেছে!···ঠোঁট নড়েছে!···উঠেছে!···দাঁড়িয়েছে!···সাবাস বুড়িয়া!!···"

—ভিতর থেকে বাহিরের ভিড়ের উপর একটা প্রচণ্ড চাপ পড়িল, তাহাদের চাপে গরম চা, সরবৎ, ঝালচানা, চীনা-বাদাম, পুরি-জিলিপি— সব ছত্রাকার হইয়া গেল—ভিড়টা আবার সমস্ত গাড়ির উপর আসিয়া পড়িল—খদ্দরধারী ভদ্রলোকটি হঠাৎ একেবারে গাড়ির মাঝখানে ছিটকাইয়া পড়িল পিছনের চাপে, আরও কয়েকজন নিতান্ত অসম্ভব উপায়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আরও মিনিট পনের সময় গেল, গাড়ি ছাড়িবার কোন লক্ষণই নাই। ঘড়ি দেখিতেছি আর গলা বাড়াইয়া অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় দেখি আমাদের শিবকালীবাবু গার্ড একটু ব্যস্তভাবে পুল থেকে নামিয়া এদিকে আসিতেছেন। চেনা লোক, ডাক দিলাম—"ও বোসজা মশাই!"

আগাইয়া অসিলেন, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—"এই যে মুখুজ্জে মশাই !…বুড়িটা গেল কোথায় মশাই ? ঐ যে হীট্‌স্ট্রোক হয়ে পড়েছিল ?"



বলিলাম—"এই তো খাড়া হয়ে উঠল, ওর সঙ্গীরা ধরে ধরে ওদিকে নিয়ে গেল।…আপনার গাড়ি ছাড়বে কখন্ মশাই ? পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো অল্‌রেডি…"

বোসজা অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—"দেখুন কাণ্ডটা! ভাল হয়ে গেল ?…আর খাঁ-সাহেব ড্রাইভার আমায় গিয়ে বললে…'গার্ড-সাহেব, খবর নিলাম বুড়িটার এখনও প্রায় আধঘণ্টাটাক দেরি, একবার বাসা থেকে ঘুরে আসি ? একটা জরুরী কাজ আদ্দেক করে ফেলে এসেছি।'…বললাম—'ঠিক আধঘণ্টা হবে তো ?—দেখো ভালো করে বুঝে।…তাহ'লে আমিও একবার হয়ে আসি।'—চাকরটা তাওয়াদার তামাকটি সেজে এনে রেখেছে আর তুমি হুইসিল্ দিয়ে দিলে তখন, তোয়াজ করে যে দুটো টানও দোব…"

হঠাৎ একটু কুণ্ঠিত হইয়াই চুপ করিয়া গেলেন, কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন—"কি জিগ্যেস করলেন—কখন্ ছাড়বে ? দেখি খাঁ-সাহেব এসেছে কিনা, নৈলে আবার ফায়ারম্যানটাকে ছোটাই, ডেকে আনুক।…বুড়িটা খুব এক খেলা খেললে যাহোক্ ··ডিউটি ভেবে তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম বলেই তো ?…নৈলে…"

হন্ হন্ করিয়া ইঞ্জিনের দিকে চলিয়া গেলেন।

দাঙ্গার একধারে

সেই দিনই গাড়ি থেকে নামিয়াছি।

আজকালকার রেলযাত্রা, সমস্ত রাত ঘুম নাই। স্নানাহার করিয়া তাড়াতাড়ি একটু ঘুমাইয়া লওয়া দরকার, বিকালে একবার শ্রীরামপুর ঘুরিয়া আসিতে হইবে, ঠিক তিনটেয় গাড়ি আমার।

শয্যা আশ্রয় করিব, দেখি ঘরের এককোণে বন্ধুবরের কন্যা রুচি গভীর অভিনিবেশের সহিত খেলায় ব্যাপৃত। গেল বছরই এত পাকা হইয়া উঠিয়াছিল যে ওর মা নামকরণ করিয়াছিল অরুচি, আমি ডাকিতাম বুড়ি বলিয়া। দেড় বছরও বয়স নয় তখন, এবার ঠোঁট জড়ো করিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া ডল্ পুতুলটাকে আদর-যত্ন করিবার ঘটা দেখিয়া বুঝিলাম ওর আর কিছু বাকি নাই।

ডাক দিলাম—"বুড়ুমা এসো। এসোদিকিন একটু গল্পসল্প করি দুটো সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে…"

আসিয়াই জলখাবারের টেবিলে পুরানো ভাব ঝালাইয়া লওয়া হইয়াছে, প্রথম পরিচয়ের আড়টা নাই আর, বুড়ি না দেখিয়াই ঠোঁট দুইটা চাপিয়া উত্তর করিল—"দাঁড়াও এখন আমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে হবে, বায়না ধরেছে…"

বলিলাম—"আমিও তো ছেলে, তায় সমস্ত রাত গাড়িতে ঘুম হয়নি…"

বুড়ি আমার দিকে একটু ঘুরিয়া তাকাইল, কি যেন একটু ভাবিল, তাহার পরে চেয়ারে উঠিয়া পুতুলটাকে আলমারির মাথায় তুলিয়া রাখিয়া আমার বিছানায় উঠিয়া আসিল। প্রথমে গল্পর সঙ্গে আস্তে আস্তে বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল; কচি আঙুলের জাদুস্পর্শে যখন বেশ তন্দ্রা

আসিয়াছে, মনে হইল বালিসের মধ্যে হাঁটুটা প্রবেশ করাইয়া আমার মাথাটিকে আস্তে আস্তে যেন নাচাইতেছে। তাহার পরে অঘোরে ঘুমাইয়াছি।

ঘুম ভাঙিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি দুটো চল্লিশ হইয়া গিয়াছে। এ ট্রেনটা বোধ হয় আর পাওয়া গেল না। এই মিনিট কুড়ির মধ্যে মোড়ে গিয়া বাস ধরিয়া হাওড়ায় পৌঁছানো—আজকাল যা অবস্থা—প্রায় অসম্ভবই। এর পরে গেলে কিন্তু ফিরিতে সন্ধ্যা; একে এমনই বিপজ্জনক, তাহার উপর নামিয়া হয়তো শুনিব এ অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারি হইয়া গিয়াছে। আমার আবার দিন তিনেকের মধ্যেই কোন রকমে কাজ সারিয়া ফিরিতে হইবে। একবার চেষ্টা করাই স্থির করিলাম। কিন্তু এক মিনিটও নষ্ট করা চলে না তাহা হইলে। স্যুটকেস থেকে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া লইয়া, পাঞ্জাবীটা কাঁধে ফেলিয়া জুতায় পা গলাইতে গলাইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

গলি পার হইয়া সদর রাস্তায় আসিয়া চলিতে চলিতেই পাঞ্জাবীটা মাথায় গলাইয়া দিতে গিয়া দেখি সেটা আমার নয়, বন্ধুবরের। ক্ষতি ছিল না, বোতাম লাগানো আছে, একটা রুমালও পকেটে আছে, কিন্তু তিনি আমার চেয়ে দুই সাইজ বেশি লম্বা এবং কম করিয়া ধরিলেও চার সাইজ বেশি স্থূল। …তখন কিন্তু আর উপায় নাই, ফিরিতে হইলে ছয়-সাত মিনিটের ধাক্কা; শ্রীরামপুরের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। জামাটা পরিতে পরিতে অগ্রসরই হইলাম।

একটু আগাইয়া বুঝিতে পারিলাম, ভুল পাঞ্জাবীর জন্য আর একটা ভুল হইয়া গেছে। যে বড় গলিটা ট্রাম-লাইনের দিকে গিয়াছে সেটা কখন্ ছাড়িয়া গেছে। কিন্তু মনে হইল ঠিক দিকেই চলিয়াছি, অর্থাৎ ও রাস্তাটা ছাড়িয়া গেলেও, সামনে আরও রাস্তা নিশ্চয় পাইব, বোধ হয় কাছে গিয়াও পড়িব আরও।

একেবারেই হিন্দুপাড়া, কোন গোলমালও নাই, তবু কেমন একটা ছমছমে

ভাব। রাস্তার ও-ফুটপাতে একেবারে লোক নাই। এ ফুটপাতেও অল্প, আর তাহাদের দেখিলে মনে হয় তাড়াতাড়ি বাড়ি কিংবা কর্মস্থানে পৌঁছিতে পারিলে যেন নিশ্চিন্ত হয়। বৌবাজারের রাস্তা কোন্‌টা একজনকে প্রশ্ন করায় মুখ তুলিয়াই আমার পানে অবাক হইয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর "এগিয়ে জিগ্যেস করুন" বলিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। কোন কারণে খুব ব্যস্ত আছে লোকটা, তবুও আর একটু গিয়া চলিতে চলিতেই একবার ঘুরিয়া দেখিয়া কতকটা আত্মগত ভাবে বলিল—"মরবে দেখছি।"

মুখের দিকে চাওয়ার ভঙ্গি থেকে ঘুরিয়া কথাটা বলা পর্যন্ত সবটুকুই আমার একটু অদ্ভুত ঠেকিল; পাগল নাকি? আশ্চর্যই বা কি? কিন্তু অত ভাবিবার ফুরসৎ নাই তখন, দরকারও নাই, সামনে চৌমাথার উপর অনেকগুলা লোককে জটলা করিতে দেখিয়া পা চালাইয়া দিলাম।

বেশির ভাগই ছেলে-ছোকরা, যুবা, দু'এক জনের একটু বেশি বয়স. আলাদা আলাদা কয়েকটা ছোট বড় দলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কি একটা ব্যাপার লইয়া ত্রস্ত আলোচনা হইতেছে, হয়তো নূতন দুর্ঘটনাই হইবে। সব চেয়ে সামনের দলটার কাছে গিয়া একজনকে প্রশ্ন করিলাম—"বৌবাজারের মোড়ে যাব, কোন্‌ রাস্তায় যাই?"

তাহার সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাইও মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল, ঝলমলে পাঞ্জাবীটার সঙ্গে আমাকে যেন মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিল, তাহার পর একটু বয়ঃস্থ গোছের অপর একজন প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবেন আপনি?"

"বৌবাজারের মোড়ে।"

একটু চুপ করিয়া আবার একটু ভালো করিয়া দেখিল আমায়, তাহার পর আবার প্রশ্ন করিল—"কি কাজ?"

একটু বিরক্ত ভাবেই বলিলাম—"রাস্তাটাই বলে দিন না আমায়, একটু তাড়াতাড়ি আছে।"

একজন একটু ছোকরা গোছের একটু রসিকতার ভঙ্গিতে বলিল—"আজকাল সব রাস্তা শেষ রাস্তা হয়ে পড়তে পারে কিনা, তাই জিগ্যেস করছেন উনি।"

সামনে একটি ছোট পার্ক, সেই দিকে চাহিয়াই সবাই জটলা করিতেছিল এতক্ষণ, এই গোটাকতক কথার পরই আমি যেন সবার কৌতুক-কেন্দ্র হইয়া পড়িলাম, ছোট বড় সব দলগুলাই আমাকে এক এক করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ প্রশ্ন ও মন্তব্য বর্ষিত হইল—

"কোথা থেকে আসছেন আপনি ?"

"যাবেন কোথায় মশাই ?"

"হিন্দু কি মুসলমান আগে খুলে বলুন তো, ওসব ভাঁওতা চলবে না।"

"আরে হিন্দু হোলে ভাঁওতা দিতেই বা যাবে কেন মশাই এ পাড়ায় এসে ? যাও, একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বের করে দাও ভাঁওতা দেওয়া।"

হতভম্ব হইয়া গেছি ; সারা কলিকাতাটা পাগল হইয়া গেল নাকি ? ও লোকটা ওরকম করিয়া চাহিয়া গেল, এদের এই রকম প্রশ্ন। বলিতে কি, যেমন ভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে আর যা সব ইঙ্গিত—সদর রাস্তার মাঝখানে আর এদিকে দিন-দুপুর হইলেও একটু একটু ভয় পাইয়া গেছি। ততক্ষণে এটাও বুঝিতে পারিয়াছি যে সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে আমার গায়ের পাঞ্জাবীর সাইজের একটা সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু তখন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলে ফলটা বিপরীত দাঁড়াইবে জানিয়া, বেশ সাহসের সঙ্গেই বলিলাম—"আমি পথ জানতে চাইলাম, আপনারা উলটে ঘেরে নিলেন কেন এমন করে ? আমায় গাড়ি ধরতে হবে, সরুন···"

যেদিকটা ঠেলিয়া বাহির হইব, দলটা আরও পুরু হইয়া উঠিল সেদিকটা, হয়তো অনুচিত হইয়াছিল, কিন্তু সত্যই মরিয়া হইয়া উঠিলাম, উগ্রভাবে সবার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম—"পুলিশ ডাকব তাহ'লে, পথ ছাড়ুন।"

আবার প্রশ্ন মন্তব্যের ফুলঝুরি উঠিল—

"নিজের জন্যে কষ্ট করে পুলিশ ডাকবেন কেন? আমরাই ডেকে দিচ্ছি!"

"সাজ ঐ রকম করেছে; আসলে বদমাইস।"

"খপ্পরে এসে পড়েছ মনে থাকে যেন।"

"নাম কি বল তো—তাড়াতাড়ি।"

"এক ঘা দিন না বসিয়ে মশাই—'ষড়া অন্ধা' বেরিয়ে পড়বে, সংখ্যাগুরু কি সংখ্যালঘু আপনি জাহির হয়ে যাবে…"

আসিয়া যে দলটিকে প্রথমে প্রশ্ন করি সেটি একটু আলাদা হইয়া কি যেন পরামর্শ করিতেছিল, মাঝে মাঝে দু'একজন আমার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে সেই বয়ঃস্থ লোকটি বাহির হইয়া ভিড় ঠেলিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বেশ শান্ত কণ্ঠে বলিল—"আপনি ঘাবড়াবেন না, কিছু ভয় নেই আপনার…"

বিরক্তি খুবই জমিয়া উঠিয়াছে মনে, উত্তর করিলাম—"ভয়ের কথা ওঠে কোথা থেকে? কি করেছি যে…"

"বটেই তো, নিশ্চয়।…আপনারা একটু ভিড় ছাড়ুন—পাৎলা হও ভাই তোমরা একটু—মিলিটারি পেট্রোলের চোখে পড়লে এখুনি গুলি চালিয়ে বসবে।…আপনি বরং এদিকটা আসুন, এই গলিটার মধ্যে—"

আমায় সঙ্গে করিয়া পাশের একটা গলিতে প্রবেশ করিল, সঙ্গে রহিল ওর নিজের দলের কয়েকজন। আরও সবাই আসিতেছিল—ঘুরিয়া ডান হাতটা তুলিয়া একটু মিনতির স্বরে বলিল—"বুঝতেই তো পারছ ভাই, চোখের সামনেই দেখছ; ভিড় ক'রো না, দোহাই…"

তবু আসিলই কিছু কিছু, বাকি সব ওদিকের হুজুগে গিয়া যোগ দিল। গলির একটু ভিতরে গিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবেন?"

উত্তর করিলাম—"সে প্রশ্ন করে আর লাভ নেই…"

"তবু ?"

"যাচ্ছিলাম হাওড়া স্টেশন, সে পথ আপনারা মেরে দিয়েছেন, ঠিক তিনটের আমার গাড়ি ছিল, এতক্ষণ বোধ হয় লিলুয়া পেরিয়ে গেছে…"

ভদ্রলোক আর একবার আড়চোখে আমায় আমার পোশাকের সঙ্গে যেন মিলাইয়া দেখিল। একটু যে রসিকতা করিলাম তাহাতে ওদিকে খুকখুক করিয়া একটু হাসি উঠিল। ভদ্রলোক পিছন ফিরিয়া একটু যেন চোখরাঙানি দিয়া আবার আমার পানে ফিরিয়া চাহিল, বেশ শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল—"বাড়ি কোথায় ?"

বলিলাম—"বেহারে।"

একটু খুকখুক আওয়াজ উঠিল, ভদ্রলোকও একটু মুচকি না হাসিয়া যেন পারিল না, বলিল—"এটা বেহার নয় তো, ক'লকাতা।"

উত্তর করিলাম—"এখানে বাড়ি নেই তো আমার, বাসা আছে।"

—খুকখুকুনিটা একটু বাড়িয়া গেল। ভদ্রলোক দলের কাছে যেন একটু হালকা হইয়া গিয়া বলিল—"সে যাই হোক…হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছিলেন ? বেশ যান…তিনটের গাড়িটা এখনও লিলুয়া যায়নি ; টাইমিং সব বদলে গেছে কিনা, বেহারে থেকে টের পাননি আপনারা। ওটা তিনটে সাঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে। তবে একলা যাবেন না, লোক দিচ্ছি। ....সময়টা তো দেখছেন,—হাওড়া স্টেশন বেঁচে থাকবে আমাদের জন্যে—একটু ভুল হয়ে গেলে আমরাই বেঁচে থাকব কিনা হাওড়া স্টেশনের জন্যে সেই হচ্ছে কথা।"

সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া জন চারেক বেশ শক্ত গোছের যুবককে বলিল—"যাও, তোমরা পৌঁছে দিয়ে এস।"

মনটা খিঁচড়াইয়া গেছে, একবার মনে হইল বাসায় ফিরিয়া যাই। তাহার পর আবার ভাবিয়া দেখিলাম, সময় নাই হাতে, আজকের অভিজ্ঞতার পর কলিকাতাও বিষ হইয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচা যায় ; হিসাব করিয়া দেখিলাম তিনটে সাঁয়ত্রিশেই যদি হয়

গাড়িটা, আমি ওখানে ঘণ্টা দুয়েক সময় পাইয়া যাইব ; কাজ চলিয়া যাইবে।

যুবকদের বলিলাম—"বেশ, চলো।"

গলিঘুচি যা ঘুরাইল তাহাতে আমার আন্দাজে ওরকম পাঁচখানা বৌবাজারের মোড় পার হইয়া যাওয়া যায়। অস্বীকার করিব না মাথা বেশ গুলাইয়া আসিতেছিল, এমন কি সাহস ধরিয়া রাখাও শক্ত হইয়া আসিতেছিল মাঝে মাঝে, মরিয়া হইয়া কয়েকবার চটিয়াও উঠিলাম। "এই এসে গেলাম ; এদিক দিয়ে একেবারে মাঝামাঝি গিয়ে পড়ব"—বলিয়া ক্রমাগতই আগাইয়া চলিল। শেষ কালে একটা গেটওলা বড় বাড়ির সামনে আনিয়া হাজির করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, আমি দাঁড়াইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"এ তো হাওড়ার স্টেশন নয়।"

একজন একটু রসিকতা করিয়াই উত্তর দিল—"মনে হচ্ছে না সেরকম ?"

তাহার পর হাসিয়া বলিল—"আসুনই তো দয়া করে। এখান থেকেই হাওড়া স্টেশনের ব্যবস্থা হবে।"

অবস্থা গতিকে একটু সম্মোহিত হইয়াও পড়িয়াছিলাম নিশ্চয়, উহাদের পিছনে পিছনে গেটের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে গিয়াই বুঝিতে পারিলাম, একটা আশ্রিত-কেন্দ্র গোছের ব্যাপার। বেশ বড়, একটু পুরানো গোছের বাড়ি, তবে বাড়ির মালিক নাই বলিয়া বোধ হইল। খুব বেশি না হইলেও কিছু কিছু আশ্রিত গোছেরই লোক ঘোরাফেরা করিতেছে বাহিরে ; ভিতরে নিশ্চয় আছে আরও। আমরা প্রাঙ্গণটার একধারে গিয়া উঠিলাম, বাড়ি থেকে একটু আলাদা দুইটা বড় বড় ঘর, বোধ হয় জমিদারির সেরেস্তা, একটার মাথায় একটা কাঠের ফলকে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—রেস্‌ক্যু অফিস।

আমায় কতকটা যেন তিনজনের হেপাজতেই প্রাঙ্গণের এক জায়গায়

দাঁড়-করাইয়া একজন আপিসের ভিতর চলিয়া গেল। চাপা গলায় কথাবার্তা হওয়ায় কিছু শুনিতে পাইলাম না, শুধু—'ছটকে বেরিয়ে পড়েছে বোধ হয়'—'জিদ ধরেছে' 'হাওড়া স্টেশন' এইরকম কতকগুলা ছাড়াছাড়া কথা কানে গেল। মরিয়া গোছের একটা কি করা যায় মনে মনে ভাবিতেছি, এমন সময় ছোকরা আসিয়া বলিল—"চলুন।"

বলিলাম—"কোথায়?—কাঠগড়ায়, না, একেবারে ফাঁসিকাঠে?"

ছোকরা অল্প একটু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না। চারজনে গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

দুইটি টেবিল, দুইজন লোক। একজন কমবয়সী, ছোকরা বলিলেও চলে, সামনে একটা মোটা খাতা খোলা, একটা কলিকাতার ম্যাপ, একটা স্ট্রিট ডাইরেক্টারি, আরও কিছু কাগজপত্র, কয়েকটা ফাইল। অপর লোকটি অপেক্ষাকৃত উঁচু টেবিলের সম্মুখে বসিয়া; টেবিলের উপর একটা টেলিফোন। মোটা, সমস্ত শরীরে চুল, পা খুলিয়া বসিয়া আছে। আমি যখন প্রবেশ করিলাম আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া টুসকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাই তুলিতেছিল, চোখ দুইটি মুদ্রিত; শেষ হইলে আমার পানে চাহিয়া কতকটা বিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল; তাহারপর না হাসিয়া ঠোঁট দুইটার দুইপ্রান্ত বিস্তৃত করিয়া "হুঁ···" করিয়া একটা টানা আওয়াজ করিল, তেমনি টানা ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করিল—"নাম?"

নাম বলিলে পাশের ছোকরাকে আদেশ করিল—"লেখ হে।" তাহারপর আবার সেই ভাবে প্রশ্ন করিল—"বাড়ি কোথায়?"

গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ছোকরাদের মধ্যে একজন বলিল—"বলুন বাড়ি, ভয় নেই।"

উত্তর করিলাম—"ইচ্ছে বলেও একটা জিনিস আছে তো?"

অপর একজন ছোকরা ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাড়ি বেহারে বলছেন, এখানে বাসা।"

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে তুড়ি সংযোগে আর একটা হাই তুলিয়াছে, শেষ হইলে বলিল—"তা তো বুঝলাম, কিন্তু রাস্তা, নম্বর বলতে হবে তো ?"



প্রশ্ন করিলাম—"কেন বলুন তো ?"

"পাঠিয়ে দিতে হবে তো ?"

এতক্ষণে যেন একটা আলোকরশ্মি চোখে ঠেকিল, সেটা কিন্তু তখনই

নিভিয়া গেল। বিপদ যখন আসে আটঘাট বাঁধিয়াই আসে ; বন্ধুবর আগে থাকিতেন পার্কসার্কাসের দিকে, সেখানেই বরাবর উঠিয়াছি, নামও মনে আছে, কিন্তু নূতন বাসার রাস্তার নামটা একেবারে মনে নাই। তিনি একটা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার জন্য স্টেশনে আসিবেন লেখায় অতটা মনে করিয়া রাখা হয় নাই।

বেশ একটু ঘাবড়াইরা গেলাম, এবং উত্তর যাহা দিলাম তাহা যে সহজ মানুষের মতো হইয়াছিল এমন বলিতে পারি না। বলিলাম, "আগে ছিল গোলাম আলি লেন, পার্কসার্কাস..."

একটা হাই তুলিবার মুখে থামিয়া গিয়া আবার আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু, ভুলটা শোধরাইয়া লইবার জন্য যেন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"এখন আছি—এখন উঠেছি—কি এক চ্যাটার্জি লেন—বৌবাজারের খানিকটা ওদিকে..."

ভদ্রলোক অলস ভাবে মাথাটা একটু নাড়িল, তাহারপর ছোকরার দিকে ঘাড়টা হেলাইয়া বলিল—"দেখো তো ও এরিয়ায় চ্যাটার্জি লেন কি আছে..."

ছোকরা ঠায় আমার মুখের পানে চাহিয়া ছিল, আদেশটাতে সচকিত হইয়া ম্যাপের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া বলিল—"একটা নয়, অনেকগুলো আছে..."

ক্লান্তস্বরে আদেশ হইল—"পড়ে যাও..."

আসলে ওটা আমার একেবারেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া হইয়াছিল, চ্যাটার্জি কি চক্রবর্তী, কি চৌধুরী, কি মোটেই ও ধরণের কিছু কিনা মনে ছিল না আমার। মনের অবস্থা চরমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এর উপর আরও গোলমাল বাড়াইবার ইচ্ছা না থাকায় ও পন্থাই ছাড়িয়া দিয়া একেবারে চরমেরই আশ্রয় লইলাম, বেশ একটু গলা চড়াইয়াই বলিলাম—"মশাই, বৌবাজারের রাস্তা জানতে চেয়েছিলাম—এই ছোকরার কাছে, সেই সামান্য একটা প্রশ্ন থেকে এ অবস্থায় কি করে একটা মানুষে পৌছুতে পারে ধারণায়

আসছে না আমার। আপনাদের কথাবার্তা ব্যবহারে মনে হচ্ছে যেন পাগল ঠাউরেছেন আমায়—পাগল করে তোলবার ক্ষমতা যে আপনাদের আছে সে একশ'বার স্বীকার করি, কিন্তু আপাতত কি পেয়েছেন বলুন দেখি যার জন্যে এতটা ?…পাঞ্জাবী ? গাড়ি ধরতে হবে বলে তাড়াতাড়ি কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়েছি—আমার বন্ধুর—যখন টের পেলাম...."

অনেকখানি কথা, অথচ পরিষ্কার সামঞ্জস্য আছে, ভদ্রলোক ওরই মধ্যে একটু সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্লান্তভাবে হাতটা তুলিয়া থামিতে ইসারা করিল—হাঁক দিল "দরবেশ ! ঘর থেকে আরশিটা নিয়ে আয় তো একবার।"

একটা চাকর একটা গোল জাপানী আরশি লইয়া আসিলে আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া আবার একটা লম্বা চওড়া হাই তুলিয়া টুসকি দিতে লাগিল।

* * *

বুড়ি আমার দফা নিকেষ করিয়াছে : ডলপুতুলের জায়গায় জ্যান্ত ছেলে পাইয়া প্রায় কান পর্যন্ত টানিয়া কাজলের প্রলেপ দিয়াছে, দুটি গালে টকটকে করিয়া আলতার ছোপ দিয়াছে, কপালে একটি মানানসই কালির টিপ,—ঘুমন্ত ছেলেকে যতদূর ভালো করিয়া সাজানো যায়....

* * *

সব শুনিয়া ভদ্রলোক টেলিফোনটা তুলিয়া লইল। কনেক্শন পাওয়া গেলে ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল—"হ্যাল্লো ! পাগলাগারদের গাড়িটা আর পাঠাতে হবে না....ঠিক হয়ে গেছে।"

শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইয়াছিল দেখিয়া শুধু আতঙ্কিতই হইলাম, রাগ করা আর চলিল না।

কে এলেন ?

কৈলাসধামে নন্দিকেশ্বর মহাদেবীর চরণ-বন্দনা করিয়া বলিল—"মা, মর্তধাম পরিক্রমা করে ফিরে এলাম। বর্ষা বিগত। শরদৃতুর আগমনে ধরণীর হরিৎ প্রাঙ্গণে দিবাভাগে আ-তপ্ত রৌদ্র এবং রজনীতে আ-শীতল জ্যোৎস্নার লীলা-বিহার আরম্ভ হয়ে গেছে। স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ বুকে আকাশের ইন্দ্রনীলের প্রতিবিম্ব, পুষ্করে-তড়াগে বিকশিত কুমুদকহ্লারের সমারোহ। স্থলকমল আকাশপথে তার গোলাপী আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে, শেফালি তার আলিম্পন করেছে শুরু, কাশবনের চামরেও লেগেছে দোল। মা, তুমি যাবে তাই সবাই উন্মুখ, সবই প্রস্তুত, শুধু একটা জিনিসের অভাব দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

মহামায়া ভক্ত ভৃত্যের মনের কথা বুঝিয়াও একটু ম্লান হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"অভাবটা কি দেখলে বৎস ?"

"তোমার আগ্রহের মা। তোমার যেন একটুও গা নেই যাবার। দেখেছি তো আগে, মর্তের আগমনীর সুর তোমায় যেন পাগল করে তুলত, বাপের বাড়ির জন্যে কচি মেয়ের মতোই তোমার মন চঞ্চল হয়ে গিয়ে পদে পদে হোত ভুল, পিতা ভোলানাথের সঙ্গে পদে পদেই হোত তোমার বিবাদ। আমাদের সে-আনন্দ এ সংসার থেকে যেন উঠেই গেছে মা; কয়েকবছর থেকেই মুখটি বুজে দেখে যাচ্ছি, এবার আরও বাড়াবাড়ি দেখে, তোমায় আরও নিস্পৃহ হয়ে যেতে দেখে কথাটা বলে ফেললাম, অপরাধ নিও না। কৈ, লক্ষ্মী-গণেশাদির মধ্যেও তো আর সে রকম আগ্রহ দেখি না মাতুলালয়ের জন্যে..."

পিত্রালয়ের সম্বন্ধে যে একটা ঔদাসীন্য আসিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কারণগুলি জটিল। এতদিন কেহ প্রশ্নাদি না করায় দেবী নিশ্চিন্তই ছিলেন, একটু ফাঁফরে পড়িলেন; বাপের বাড়ির কেচ্ছাই তো!

নিজের মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে বাধেই। একটু চিন্তা করিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন, বলিলেন—"বৎস নন্দিকেশ্বর, কাল পরিবর্তনশীল ; মহাকালের পার্শ্বচর বলে তুমি এটা বোধ হয় বুঝতে পার না, কিন্তু অতীতে আর বর্তমানে অনেক প্রভেদ হয়ে গেছে। এখন একটা কাজ করতে হলে নিজের মতটাকে চেপে রেখে বাকি সবার মতকে দিতে হয় প্রাধান্য। আগে আমিই ছিলাম গৃহস্থালীর সর্বেসর্বা, এখন ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে তো কোন কথাই নেই, দাসদাসী, এমন কি কর্তার মতকেও আমল দিতে হয় সব কাজে। ব্যাপারটা যখন এইরকম তখন আমায় না জিগ্যেস করে অন্য সবাইকেই জিগ্যেস করা বিহিত। কারুরই মন নেই যেতে, কাজেই আমিও মনমরা হয়ে আছি।"

প্রথমে সাক্ষাৎ হইল মহাদেবীর অন্যতমা যাত্রাসহচরী জয়ার সহিত। নন্দী বলিল—"সখি জয়ে, শরৎ আগত, এই সময় জগজ্জননীকে মর্তে তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অন্যান্যবার তুমি চঞ্চল হয়ে উঠতে। এবারে তোমার এক স্বভাবগত যৌবনচাঞ্চল্য ছাড়া তো কোন চাঞ্চল্যই চোখে পড়ছে না আমার।"

জয়া বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"নন্দিকেশ, তুমি আর আমায় খুঁড়োও না, একে নানা কারণেই আমিও তোমাদের মতোই স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়ে চলেছি। তোমার দগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি রমণীর যৌবন ছাড়া আর কোন দিকেই ধাবিত হয় না, নৈলে দেখতে পেতে মর্তের পূজা কোথা হতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সব কথা ছেড়ে দাও, বৎসরান্তে গোটাকতক করে ছাগশিশু বলি পাওয়া যেত, মর্তে গিয়ে একটু মুখ বদলানো হোত, মাকে বৈষ্ণবী করে দিয়ে সেটুকু পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কুষ্মাণ্ডবলি খাবার জন্যে আর যার সাধ থাকে থাক্‌, জয়ার নেই, সুতরাং যখন তুমি প্রসঙ্গটা তুললেই তখন আমার অনিচ্ছার কথাটা তুমি স্পষ্টতই মহাদেবীকে জানিয়ে দিও।"

জয়ার সহিত আরও একটু কৌতুকালাপ করিয়া নন্দিকেশ্বর লক্ষ্মীসমীপে গমন করিল, বলিল—"নারায়ণী, শরদাগমে মর্তধামে যাওয়া সম্বন্ধে কৈলাসপুরীতে আগ্রহের আত্যন্তিক অভাব দেখে আমি মহাদেবীর নিকট গিয়েছিলাম, তিনি বললেন পুত্রকন্যাদের ঔদাসীন্যে তিনি এ বিষয়ে একেবারে বিগতস্পৃহ হয়েছেন, যদি তাঁদের উৎসাহ থাকে তবেই তিনি আবার এ বিষয়ে উদ্যোগী হন, নতুবা…"

লক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি আমার এই কণ্ঠহার গ্রহণ করো,—এতবড় সুসংবাদ অনেকদিনই কেউ আমায় দেয় নি। এতদিনে দেবীর তাহলে সুমতি হয়েছে! কয়েক বৎসর ধরে নৈবেদ্যের যা অবস্থা লক্ষ্য করে আসছি তাতে দেবী ভিন্ন আমাদের আর সবার কাছেই এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তাঁর বাপের বাড়িতে সব জিনিসই বাড়ন্ত। এ অবস্থায় সামান্য মানবীও নিজের সংসার নিয়ে গিয়ে পিতৃকুলকে বিব্রত করে না, অথচ ত্রিনয়নী এ-বিষয়ে একেবারেই চোখ বুজে যে কি করে থাকতে পেরেছিলেন সেইটিই আমাদের আশ্চর্য বোধ হোত। যা হোক তাঁর চোখ খুলেছে দেখে আমি নিশ্চিন্তই হলাম। সন্তান হয়ে আমার বলা শোভা পায় না, মহাদেবী ভাববেন—এরা সব আধুনিকা হয়েছে, আমাদের আর আমল দিতে চায় না। তুমিই আমার হয়ে জানিয়ে দিও যে আমার উৎসাহ অনেক দিনই লুপ্ত হয়েছে এবং আবার ত্বরায় ফিরে আসবে বলে কোন ভরসা দেখছি না।"

সিদ্ধিদাতা গজানন বিল্বতলে একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া হস্তলিপি-সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। মর্তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ব্যাসদেব যে-কোন মুহূর্তেই বিরাটতর মহাভারত রচনাকল্পে তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারেন। নন্দী করজোড়ে গিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলে তিনি শুণ্ডটি স্বীয় স্কন্ধের উপর ন্যস্ত করিয়া সপ্রশ্ন, গম্ভীর দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিলেন। নন্দী কহিল—"বিনায়ক, আপনি যেরূপ লিপিকার্যে ব্যস্ত, আপনাকে বিরক্ত করতে আমি নিতান্তই অনিচ্ছুক; শুধু এইটুকুই স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি যে, শরৎ ঋতু আগত এবং আপনাদের সবারই মর্তে অবতরণের সময় হয়ে এসেছে; সুতরাং…"

গণপতি শুণ্ড কুঞ্চিত করিয়া অতিরিক্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—"নন্দিকেশ্বর, জননীই কি তোমায় ঐ দৌত্যে প্রেরণ করেছেন ?—তাহলে তাঁকে বলো, হেরম্ব যেতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, তিনি আর-সবাইকে নিয়ে যান এবার, একজন না গেলে এমন কিছু ক্ষতিও হবে না।"



গণপতির ভাবান্তর দেখিয়া নন্দী একটু সভয়েই করজোড়ে বলিল—"হেরম্ব, মা যদি প্রশ্ন করেন আপনার না যাবার কারণটা কি, তা না জানাতে

পারলে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, অধিকন্তু আমায় দৌত্যকার্যের নিতান্তই অনুপযোগী বলে মনে করবেন।”

গণপতি একটু অপ্রসন্নভাবেই কিছুক্ষণ নীরবে দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“নন্দী, অধিক আলোচনা করবার অবসর আমার নেই, শুধু একটি কথাই তাঁকে ব'লো,—অন্নপূর্ণা পূজা নিতে চলেছেন, সঙ্গে লক্ষ্মী,—কিন্তু অন্য দ্রব্যসম্ভারের কথা ছেড়ে দিলেও এমন একমুষ্টি তণ্ডুলের পর্যন্ত অভাব যে নিতান্ত অল্পাহারী, ক্ষীণজীবী আমার মূষিকটিকে পর্যন্ত অনাহারে আসতে হয়। এর লজ্জা তাঁদের না সঙ্কুচিত করুক আমায় করে। গত কয়েক বৎসর থেকে আমি নিজেই অনাহারের জন্যে লঘুভার হয়ে থাকি, তাই সে-বেচারি কোন রকমে এই দীর্ঘ পথ…যাও নন্দী, সব প্রসঙ্গ তুলতে গেলেই রাগ বেড়ে যায়,—মহাদেবীকে ব'লো আমি লিপিচর্চায় নিতান্তই ব্যস্ত, এবারটা যেন আমায় ক্ষমা করেন।”

নন্দী অতঃপর বাগ্‌দেবীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল অঙ্কে বীণা লইয়া দেবী ধ্যান-মুদিত নয়নে একটি রাগিণী-সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল, কেননা একটু ত্রুটিবিচ্যুতিতেই অভিসম্পাত দিয়া বসিতে ভাইবোনে একেবারে মুক্তকণ্ঠ,—তায় ইনি আবার যেরূপ বাক্‌সিদ্ধা! কিঞ্চিৎ পরে সুর সংহত করিয়া দেবী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই চাহিয়া বলিলেন—“নন্দিকেশ্বর যে! কতক্ষণ? আমায় ডাকো নাই কেন?”

নন্দী বলিল—“বীণাপাণি, যেমন তল্লীন হয়ে সঙ্গীত-সাধনায় ব্যাপৃত রয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে ভুলেই বসে আছেন যে শরৎ ঋতু সমুপস্থিত এবং আপনাদের জন্যে মর্তলোক উদ্‌গ্রীব হয়ে পথ চেয়ে আছে।”

“কেন?”

এমন অদ্ভুতভাবে হঠাৎ প্রশ্নটা করিলেন যে নন্দীকে একটু বিমূঢ়ভাবেই

নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল, তাহার পর কতকটা স্খলিতকণ্ঠেই বলিল—"কেন ?—পূজা……"

দেবীর বীণানিন্দিত কণ্ঠে অভিমানের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, কহিলেন—"পূজা আর হয় নন্দিকেশ ? মন্ত্র নাই, নিষ্ঠা নাই, শ্রদ্ধা নাই, অন্তরের আকুতি নাই—এ যা বাৎসরিক একটা ঠাট বজায় রাখা—এ'কেও তুমি পূজা বলো ? আমাদের সবই সয়, ব্রতহীন, অনাচারী, অশিক্ষিত পুরোহিতের মন্ত্রে আমায় পদে পদেই আঘাত করুক, আমি অত ধরি না, কিন্তু মায়ের অবমাননা এরকম বছরের পর বছর সহ্য করে যাওয়া আমার পক্ষে উত্তরোত্তর অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শরৎ এসে আমার অন্তরেও স্পন্দন জাগিয়েছে বৎস, কিন্তু সে নিতান্ত বেদনার স্পন্দন বলেই আমি সঙ্গীতে বিস্মৃতি খুঁজছিলাম। এই বিস্মৃতিই আমার অবলম্বন ; মাকে ব'লো আমায় মার্জনা করতে……"

কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, নন্দী চরণ-বন্দনা করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া বাঁচিল।

কার্তিকের আকৃতি গজাননের চেয়ে শতগুণে গম্ভীর, যেন রুদ্ধ ক্ষাত্রতেজ তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতেছে ; ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কঠোর ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"কে, নন্দিকেশ ? মাতা নিশ্চয় মর্তের জন্য প্রস্তুত হতে বলে পাঠিয়েছেন ?"

নন্দিকেশ্বর নতি জানাইয়া বলিল—"কতকটা সেইরকমই কুমার, লগ্নবেলা তো আসন্ন।"

"তারা আমাদের আর চায় কিনা সে খবর নিয়েছেন কি দেবী ?—না, গতানুগতিক পদ্ধতিতে এবারেও যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছেন ?"

"মর্তে তো সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ দেখলাম কুমার—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে……"

কার্তিকেয় ঈষৎ বিরক্তির সহিত বাধা দিয়া বলিলেন—"গঞ্জিকা সেবনে তোমার বুদ্ধি স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে নন্দিকেশ, আমি প্রকৃতিদেবীর আয়োজনের

কথা বলছি না, মানুষ, যারা তাঁর পূজা দেবে, তারা কি তাঁকে সত্যই আর চায়? চাওয়া না-চাওয়ার অপেক্ষা না করে নিতান্ত অভ্যাস বশেই কিংবা শুদ্ধ পিত্রালয়ের আকর্ষণেই তিনি যদি যাওয়াই মনস্থ করেন তো প্রহরণ-ধৃতা দশভুজা রূপে যাওয়া তাঁর নিতান্ত নিরর্থক হবে—এবার সেটা তাঁকে ভালো করে জানিয়ে দাওগে নন্দিকেশ; কেননা ওঁর পূজকদের মধ্যে ও-মূর্তির আর কোন প্রয়োজন নেই; তিনি যেন ম্যুব্জদেহা বৈষ্ণবীর আকারেই গমন করেন। আমার কথা বাদ দাও এবার। মা মহামায়া, সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার হয়তো তাঁর ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমি নিজের প্রকৃতিকে এতদূর পরিবর্তিত করে নেবার সামর্থ্য রাখি না, সুতরাং আমি এ হাস্যকর অভিনয়ের বাইরেই থাকতে পছন্দ করি।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় দেখিয়া নন্দিকেশ্বর আর অপেক্ষা না করিয়া ঝটিতি পশ্চাদপসরণ করিলেন।

বাকি শুধু মহেশ্বর। মৌতাতে ছিলেন, নন্দিকেশ্বর চরণবন্দনা করিয়া দাঁড়াইতে স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—"নন্দী?—খবরটা কি?"

নন্দী করজোড়ে বলিল—"প্রভু সর্বজ্ঞ। শরৎ-আগমনে সবাইকে মর্তধামে নিয়ে যাবার জন্যে কিরকম হয়রান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর কতটুকু সফল হয়েছি সবই প্রভুর গোচরীভূত। কারুরই গা নেই—মহাদেবী থেকে আরম্ভ ক'রে; তাই ভাবলাম যদি প্রভু অন্তত......"

"—রাজি হন তো সমস্যাটা মেটে, এই তো?...বোস্ নন্দী।"

নন্দী উপবেশন করিলে বলিলেন—"ভোলানাথের অনেক দুঃখ, আজ যখন নিজের হতেই তুললি কথাটা তো মন খোলাসা করে বলি একটু। আমি যে এ পূজোয় যাই তার দুটো কারণ আছে নন্দী, প্রথম রণচণ্ডী গৃহিণী, এ যে কী জ্বালা দেখতেই পাচ্ছিস, অষ্টপ্রহর কলহ আর প্রতি কলহেই আমারই হার। সুড় সুড় করে পেছনে পেছনে যাই, কেননা এর ওপর আর চটাতে সাহস হয় না। দ্বিতীয়ত মান অপমান আমি সিদ্ধির সঙ্গে গুলে

খেয়েছি, আজ অনেক দুঃখেই সে কথা স্বীকার করছি তোর কাছে। নৈলে পূজোটা গৃহিণীর—সে জায়গায় আমার যাওয়াটা কি মানায়—তুই-ই বল্ না ? খাতির করে অবশ্য আমায় চালচিত্রের মাথায় বসিয়ে রাখে, কিন্তু খাতিরটা যে কত তা মূর্তির বহর দেখলেই টের পাওয়া যায় না কি ?···যেতুম না নন্দী, কোনমতেই যেতুম না, কিন্তু ঐ যে বললাম রণরঙ্গিণীকে চটাতে সাহস হয় না। তোকে সব কথা বললাম, কেন না জানি তুই মহাদেবীর কানে এ সব তুলতে যাবি নি।—এবারে আবার একেবারে যেতে ইচ্ছে নেই।”

“এবারে আবার বিশেষ কি হোল দেব ?”

“গজানন তোকে যা বললে আমারও সেই কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে নন্দী, তুই যখন গৃহিণীর কাছে কথাটা পৌঁছে দিবি নি, তখন বলেই ফেলি। বাপের বাড়ি যাচ্ছেন কে ?—না, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আর তাঁর কন্যা লক্ষ্মী, অথচ দুর্ভিক্ষে সমস্ত তল্লাটে হাহাকার। এর লজ্জা যখন তাঁদেরই নেই তখন আমারই বা থাকবে কেন ? বলেইছি তো আমি ওসব বালাই সিদ্ধির সঙ্গে ঘুটে মেরে দিয়েছি। কিন্তু এর আর-একটা দিক আছে,—সত্যি কথা বলতে কি, আমার ওসব আড়ম্বরের পূজো-নৈবেদ্য পোষায় না নন্দী, কেমন ধাতে সয় না। ওদিকে কাঁসর-ঘণ্টা চলত আর এদিকে চালচিত্র থেকে নেমে আমি বেরুতাম ভিক্ষেয়, লোকে ভক্তিভরে যা একমুঠো দিত তাই ছিল আমার উপজীব্য। এখন লোকে নিজেই খেতে পাচ্ছে না, আমায় দেবে কি ! যাদের কপাল একটু ভালো, রেশনের চাল বাছতে তাদের মেজাজেরও ঠিক থাকে না, ভিক্ষের বদলে গালমন্দই উপজীব্য হয়ে পড়ে। তুই কোথায় হেলাফুল ফুটেছে, কোথায় স্থলপদ্ম ফুটেছে তাই দেখে এলি শুধু, ওধারটা যদি চোখ চেয়ে একটু দেখতিস তো বুঝতিস ক্ষুদ-কুঁড়ো যা একটু জুটছিল এবারে সে দিকেও ফক্কা।···একটু সাজ্ নন্দী, বড় বক্কালি।”

মৌতাত আবার একটু জমাইয়া লইয়া বলিলেন—“ভালোই হোল নন্দী, বুঝলি ?—আমি যেতে চাইছি না বললে হুলুস্থুল পড়ে যেত। ছেলেমেয়েরা

আধুনিক—বেঁকে দাঁড়িয়েছে, এই কথা বলেই মহাদেবীকে বোঝাবি; আর আমার কথা জিগ্যেস করলে বলবি—ভোলানাথ তো আজ বেরুতে পারলে কাল চান না, ছটফট করছেন যাবার জন্মে। যা, সামলে দিগে।"

আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।

ফিরিবার পথে হইয়া গেল বিজয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ। বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে মৌতাতটা একটু জমাটি হইয়া ওঠায় নন্দিকেশ্বর কিঞ্চিৎ রসিকতা করিতে যাইতেছিল, মুর্তি দেখিয়া আর সাহস হইল না। কথা কহিল আগে বিজয়াই, রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"বিটলে ব্রাহ্মণ, তুমি নাকি মহাদেবীকে মর্তে নিয়ে যাবার জন্মে সবাইকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছ? মতলবখানা কি, খুলে বলতে পার? আমি এতক্ষণ তোমারই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। দেবীকে বোল, তাঁর যদি এতই সাধ যেতে তো বিজয়ার ব্যাপারটা অত ঘটা করে না করে যেখানে পূজো তার কাছাকাছি বিসর্জনের ব্যবস্থা যেন করেন—পুকুর ডোবা কুয়ো যেখানে হোক। পারেন তো মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলেই বিসর্জনের পালাটা যেন শেষ করে নেন। যা সব বীর সন্তান তোয়ের করেছেন, একটু বাধা পেলে রাস্তার মাঝখানে প্রতিমা ফেলে যে কি করে কোতোয়ালিতে দরখাস্ত করতে ছুটতে হয় এইটুকুমাত্র জানা আছে তাদের। এ ধরণের ঘটা তাঁর ভালো লাগে লাগুক, আমার লাগে না—অন্ন নেই, জল নেই, রাস্তার মাঝখানে আশ্বিনের রোদে মাথার চাঁদি ফাটতে থাকে। ওঁদের পূজো ওঁরা যেভাবে নেন, আমায় কিন্তু যেন বাদ দেন এবার। শুনচি, কারুর মন নেই যাবার, তুমিই নাকি জপিয়ে বেড়াচ্ছ। এ মাঝরাস্তায় আর কি বলব, সাধ থাকে তো আমায় জপাবার জন্মে আমার গৃহে যেও একবার!"

একটা অগ্নিকটাক্ষ হানিয়া ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

নন্দিকেশ্বর খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, একটা শুভফল এই হইল যে মৌতাতের যে আমেজটা জমিয়া উঠিতেছিল, সেটা একেবারেই

কাটিয়া গিয়া মাথাটা পরিষ্কার হইল। সে দৃষ্টি নত করিয়া মহাদেবীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দেবী স্মিতহাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি বৎস—বায়ুর প্রবাহ কোন্ দিকে কিছু সন্ধান পেলে ?"

নন্দী করজোড়ে নিবেদন করিল, "মা, পেয়েছি সন্ধান; দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়েছে, তাইতে মনে হচ্ছে সবার মনের বেদনাই বুকে নিয়ে তুমি ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছ। সবই বুঝলাম, কিন্তু তবু একটি কথা মনে খচ-খচ করছে মা, তবে প্রশ্ন করাটাই ধৃষ্টতা, তাই···"

"করো প্রশ্ন, আমি অভয় দিচ্ছি বৎস।"

"সবই তো তুমি ঠিক করে দিতে পার মা, তবে মায়ে-মেয়েতে এ কলঙ্কটা মাথা পেতে নিচ্ছ কেন এইটেই মাথায় আসছে না।"

মহামায়া একটু নিরুত্তর রইলেন, তারপর একটু ম্লান হাসিয়া কহিলেন—"বৎস, ভুলটা হয়েছে একেবারে গোড়ায়; ওরা আমায় অন্তর থেকে চায় না, এ মূর্তিতে চাইবার জন্যে যে তপস্যা, যে শক্তি প্রয়োজন, ওরা সেইটেই হারিয়ে এখন একটা চিরাচরিত আচারের খোলসকে পূজো করছে, সে পূজোও আবার নিষ্ঠাহীন, তাই···"

নন্দিকেশ্বর মাথাটা আরও নিচু করিয়া আরও কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"কিন্তু মা, সে তপস্যা, সে শক্তিও তো তুমিই দেবে।···থাক্, সেবকের মস্তিষ্কের যা অবস্থা, বললেও বোধ হয় সে সব উঁচুদরের কথা বুঝব না।···তাহলে যাবেন কে এবারে মর্তে মা ?"

মহাদেবীকে চিন্তিত দেখিয়া নিজেই বলিল—"আদেশ হয় তো তুলসী দেবীকে গিয়ে না হয় অনুরোধ করি মা; যেমন দেখছি, তাঁরই তো পূজো চলছে শুধু তোমার নামে।"

আধ্যাত্মিকতার দেশে

আজ সকাল থেকে মনটা বেশ ভালো আছে। আমার এক বিলাতী বন্ধুর পত্র পাইয়াছি। স্বাধীনতা লাভের জন্য অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছেন, এইবার ভারতবর্ষের পালা। পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিশ্রান্ত তথা অবসাদগ্রস্ত। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঘোরাঘুরি খোঁজাখুঁজি করিয়া পাইয়াছে মাত্র কয়েক একর জমি,—দু'খানা আমেরিকা, আফ্রিকার জঙ্গল, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, আর এসিয়ায় ভাগাভাগি করিয়া এখানে-ওখানে খানিকটা—এই পাওয়ার উল্লাসে, কাড়াকাড়ির মত্ততায় সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই কী মূল্য এর জন্য দিতে হইয়াছে তাহাকে। আজ সে উন্মাদনা গেছে কাটিয়া, তাহার উপর দু'দুখানা লড়াইয়েও সচেতন হইয়া অন্তর্বিক্ষুব্ধ পাশ্চাত্য হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে জমির বদলে মূল্য যাহা দিতে হইয়াছিল তাহা তাহার আত্মা। তাই ইউরোপের আজ নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ইউরোপ কিন্তু মরিবে না, তার মরাটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় বলিয়াই তিনি ভারতকে দেওয়াইলেন মুক্তি। ইউরোপ এখন এই মুক্ত-ভারতের পানে চাহিয়া আছে; ভারত তাহার যুগ-যুগের তপস্যা-লব্ধ আধ্যাত্মিকতা দিয়া, করুণা-মৈত্রীর বাণী দিয়া, নির্লোভ বৈরাগ্যের মন্ত্র দিয়া ইউরোপকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলুক। এই তো ভরতের যুগ-যুগের মিশন···

আরও এই ধরণের অনেক কথা। চিঠিটা পাওয়া পর্যন্তই মনটা কিসের আবেগে যেন পূর্ণ হইয়া আছে। পকেটেই রহিয়াছে চিঠিটা, কয়েক বারই পড়া হইয়া গেল, যতবারই পড়িতেছি মনে হইতেছে ধমনীতে আর্যঋষিদের পুণ্যরক্তের একটা নূতন প্রবাহ নামিল। ইউরোপকে হাতের কাছে না পাওয়ায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি; খুব বড় একটা কিছু না করিতে পারিলে বাঁচি কি করিয়া?—বাঁচিয়া ফলই বা কি?

মনের যখন এইরকম অবস্থা, ছেলেটির উপর নজর পড়িল। সদর রাস্তা

থেকে একটা গলি বাহির হইয়া গেছে, তাহার মুখেই একটা মাঝারি গোছের শিরিষ গাছ; এই গাছের একটা শিকড়ের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছে। অতিশয় শীর্ণ, পরিধানে যে একফালি বস্ত্র রহিয়াছে কৌপিনের সঙ্গেই তাহার বেশি সাদৃশ্য, বয়স ধরা একটু শক্ত তবে আন্দাজে মনে হইল ষোল-সতের হইবে। গায়ের রংটা তাঁবাটে, সন্ধ্যার পাৎলা অন্ধকারে চুলের ডগাগুলাও সেইরকম মনে হইল।

প্রথমে ভাবিলাম ছেলেটি নিদ্রা দিতেছে; নিদ্রার জায়গা এবং সময় দুইটিই কেমনতর মনে হওয়ায় কাছে গিয়া দেখি নিদ্রিত নয়, অচৈতন্য।

মনে মনে খুশি হইয়া উঠিলাম; বুঝি, উচিত নয় হওয়া—একটা মানুষ রাস্তার ধারে মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু সেবা করিয়া আধ্যাত্মিকতার পথে সদ্য সদ্য খানিকটা আগাইয়া যাইবার এমন সুযোগ পাইয়া সত্যই যে খুশি হইয়া উঠিয়াছিলাম এটা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হয়। পাশের বাড়ির লোকেদের ডাকিয়া জল জোগাড় করিলাম, পাখা আনাইলাম, বরফের জন্য লোক ছুটাইয়া দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তার ধারে ছোটখাট একটি ভিড় জমা হইয়া গেল। হাওয়া করিয়া, মুখে জলের ছিটা দিয়া, এমনকি মাথায় বরফ চাপিয়াও যে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না ইহাতে খুব যে হতাশ হইলাম এমন নয়, কেননা রোগীর চিকিৎসা এবং সেবার ব্যাপারটা একটু ঘটা করিয়া করিবার সুযোগ পাওয়া গেল। একটা গাড়ি ডাকাইয়া খুব সন্তর্পণে ছেলেটিকে শায়িত করিয়া বাড়িতে লইয়া গেলাম।

একটু গোলযোগ বাধিল; আর কাহারও তো বিলাতী চিঠির অনুপ্রেরণা ছিল না, রাস্তার মড়া বাড়িতে টানিয়া তোলায় বেশ একটু অসন্তোষের গুঞ্জন উঠিল। ইচ্ছা ছিল একেবারে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া যথারীতি পরিচর্যা আরম্ভ করা, সেটা আর হইয়া উঠিল না, বারান্দাতেই একটা মাদুর বিছাইয়া লাগিয়া গেলাম। কতকটা দায়ে ঠেকিয়া কতকটা হয়তো আমার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং কতকটা তাড়াতাড়ি আপদ বিদায়ের জন্য

বাড়ির লোকেরাও শেষ পর্যন্ত যোগদান করিল।···ওদিকে ভিড় জমিয়া পাড়ায় বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

রোগীর চোখ কিন্তু খোলে না। বাড়িতে একজন ডাক্তার, একজন ডাক্তারির সিনিয়ার ছাত্র, তাহারাই একেবারে নিজের হাতে কেসটা তুলিয়া লইল; বুক, পিঠ, পেট, মাথা সব কিছু পরীক্ষা করিয়া, বারবার চিকিৎসা পালটাইয়া হিমসিম খাইয়া গেল, কোন ইতর-বিশেষ নাই; রোগী সেই একভাবে দাঁত-কপাটি মারিয়া পড়িয়া আছে, এক একবার যদিবা চোখের পাতা বা ঠোঁট দুইটা সামান্য একটু উঠিতেছে কাঁপিয়া তো তখনি আবার যেন দ্বিগুণ নিস্তেজ হইয়া এলাইয়া পড়িতেছে।

পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গেল, আরও জনতিনেক প্রতিবেশী ডাক্তার আছেন, দুইজন বাড়িতেই ছিলেন, মুখে মুখে রিপোর্ট শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন; চিকিৎসা-পরিচর্য্যার যে ঘটা দাঁড়াইল তাহা আমারও কল্পনাতীত ছিল; কিন্তু কোনই উন্নতি নাই। ডাক্তাররা মত দিল আর খানিকক্ষণ এ-ভাবে কাটিলে রোগীকে ধরিয়া রাখা যাইবে না। খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

তখন আমার মনে পড়িল—এই যে ব্যাপারটা হইতেছে—চিকিৎসা, সেবা, এর মধ্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ছাপ কোথায়? এ-যা করিতেছি, পাশ্চাত্যের যে-কোন লোক তো এটা করিতে পারিত, বরং আরও সুষ্ঠুভাবে। ছেলেটাকে রাস্তা থেকে কুড়াইয়া আনিয়াছি, এর মধ্যে না হয় খানিকটা উদারতা আছে, কিন্তু তাহার পরে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সেই আত্মিক সাধনা কোথায়, সেই যোগসিদ্ধি, সেই বিভূতি কোথায় যাহার আশায় ইউরোপ আজ ভারতের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে? জন্ম-মৃত্যু লইয়া আমরা না একদিন সখের খেলা খেলিয়াছি নিতান্ত অবহেলা ভরেই? জীবনকে না জীবনাতীতের মহিমা দিয়া মণ্ডিত করিয়াছি? ইউরোপ আজ সেই আত্মিক মহিমার লোভেই না ভারতের শিষ্যত্বের জন্য

উন্মুখ হইয়া আছে? আমাদের এই তুচ্ছ সেবা, এই নিতান্ত যান্ত্রিক চিকিৎসার মধ্যে সে-বস্তুর সন্ধান কৈ?

উহাদের হাতে রোগীকে ছাড়িয়া একটু আলাদা হইয়া একটা ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। একান্তে গিয়া আত্মিক বল প্রয়োগ করিবার জন্য নয়, কেন না সেটা যে কী ধরণের জিনিস, কোন্ পথে, কী ভাবে তাহার আবির্ভাব হইতে পারে কিছুই জানা নাই। একান্ত আশ্রয় করিলাম নিজের দীনতার জন্য—একটা বড় পরীক্ষার সামনে মনটা বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে,—আমি না ভারতের সন্তান? তবে আজ আমার এ দুরবস্থা কেন?

অনুশোচনায় প্রায়. ডুবিয়া গেছি এমন সময় হঠাৎ একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া উঠিলাম—"প্যারেলাল! বেটা!..."

মনে হইল আওয়াজটা রাস্তায় আমাদের বাড়ির ফটকের নিকট হইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে এদিকে রোগীকে ঘিরিয়া ভিড়ের যে কলরবটা ছিল সেটা এমন হঠাৎ থামিয়া গেল যে মনে হইল একটা .কিছু অসাধারণ ব্যাপার হইয়াছে। কৌতূহলবশে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আমিও একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

ছ'ফুট লম্বা, আজানুলম্বিতকরযুগ, সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসী ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া; জটাভারে দেহের উর্ধ্বভাগ আবৃত, আগাগোড়া ভস্ম-প্রলেপ, কোমরে একটা মোটা কাছি বাঁধা, তাহার সঙ্গে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এতটুকু কৌপীন, বাঁ-হাতে একটা লাউয়ের কমণ্ডলু।

আমার সমস্ত শরীরটায় যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল, মনে হইল—এই যে পাইয়াছি! ভারতের আত্মা মূর্তি ধরিয়া যেন আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত বড় একটা বিস্ময় যে বিশ্বাস করাই যেন শক্ত হইয়া উঠিতেছে; আমার তীব্র অনুশোচনা, উষ্ম হতাশ্বাসই কি এখানকার আকাশে-বাতাসে একটা ব্যাকুল আহ্বান জাগাইয়া মহাপুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে? নয়তো এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে কি করিয়া?

অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য পা বাড়াইব এমন সময় আর একটা ডাক, আরও গম্ভীর উদাত্তে—"বেটা প্যারেলাল !! আরে শুনতা নেহি ?"

সমস্ত জায়গাটা যেন গমগম করিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়ের উপর আর একটা বিস্ময়, রোগীর কণ্ঠ বাহিয়া বক্ষের কোন্ সুদূর প্রদেশ থেকে একটা অতি ক্ষীণ শব্দ বাহির হইয়া আসিল—মসলিনের সূতার মতো অতি সূক্ষ্ম—"জী···!" চোখের পাতাও আগেকার চেয়ে যেন একটু স্পষ্টভাবে কাঁপিয়া উঠিল।

ডাক্তার তিনজন পর্যন্ত নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে, বেশ বোঝা যায় তাহাদের নাস্তিকতার দুর্গে একটা খুব বড় রকম চিড় খাইয়াছে।···প্রায় সমস্ত ভিড়টা সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসীকে ফটকের নিকট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলাম! সমস্ত জায়গাটাতে একটা থমথমে ভাব জাগিয়া রহিল।

রোগীর নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কৌন্ ই-সে লে আয়া হ্যায় ?"

লুকাইবার উপায় ছিল না বলিয়া বিনীতভাবে স্বীকার করিলাম—"আমিই নিয়ে এসেছি বাবা।"

এমন একটা রুক্ষ কটাক্ষপাত হইল যে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। সময়টা কলিযুগ এবং ভারতের যোগবলেও এখন কতকটা ভাঁটার অবস্থা চলিতেছে। উত্তরটা শুনিয়া মুখের পানে চাহিয়া অপ্রসন্ন কণ্ঠে যাহা বলিলেন তাহা হইতে এই মর্মার্থ সংগ্রহ হইল যে, ছেলেটি বাবাজীর শিষ্য—ধরায় এত মূর্খের প্রভাব বাড়িয়া গেছে যে একটু চোখের আড়াল হইবার জো নাই, তাহা হইলেই একটা না একটা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে। উপকারের সামর্থ্য নাই অথচ উপকার করার আকাঙ্ক্ষাটুকু আছে ষোলআনা —অপদার্থ সব !···

বেশ চটিয়াছেন। হাত জোড় করিয়া বলিলাম—"ঘাট হয়ে গেছে বাবা, এখন ওঁকে বাঁচিয়ে তুলুন, গরীব গৃহস্থকে প্রত্যবায় থেকে রক্ষা করুন।"

প্রশ্ন হইল—"ইলাজ ক্যা কিয়া ?" অর্থাৎ, চিকিৎসা কি হয়েছে ?

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া থেকে ব্রাণ্ডি, ইনজেকশন সবই জানানো হইল। প্রশ্নটা আবার একটু রুক্ষ হইয়া উঠিল—"তে সব ইলাজকা জানতা ক্যা হ্যায় ?" অর্থাৎ, তোরা সব চিকিৎসার জানিস কি ?

দৃষ্টিবৃত্তের মধ্যে ডাক্তার তিনজনকেও টানিয়া লওয়ায় তাহারাও সভয় মিনতির সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইল চিকিৎসার সত্যই তাহারা কিছু বোঝে না, আগাগোড়াই ভুল হইয়া গেছে।

সন্ন্যাসীর রাগ অনেকটা নরম হইল, তবুও চোখ আর ঠোঁটের কোণে বিরক্তির আকারে যেটুকু লাগিয়া রহিল তাহাতেই আমরা সবাই তটস্থ হইয়া রহিলাম।

প্রশ্ন হইল এই যে, একটা মানুষ জ্ঞানরহিত হইয়া পড়িয়া আছে এর কারণটা কি আমরা জানি, কিংবা জানিবার ক্ষমতা আছে কি, অথবা চেষ্টা করিয়াছি কি জানিবার ?

তম্বির সঙ্গে বেশ একটি আধ্যাত্মিক রহস্যের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছেন; সবাই উত্তরটা অন্যের মুখ দিয়া বাহির করাইবার জন্য পরস্পরের পানে চাহিলাম, শেষে ডাক্তার তিনজনের অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ দেখিয়া আমিই সাহস করিয়া করজোড়ে বলিলাম—"না বাবা, সে জ্ঞানের জন্যে যোগবল প্রয়োজন, সে আর আমরা কোথায় পাব, বিষয়-লিপ্ত জীব···"

"তো ফিন্ ?"—বলিয়া সন্ন্যাসী আমার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সেইভাবে ওদের তিনজনের মুখের উপর বুলাইয়া লইলেন; ভাবটা—তাহলে যাস্ কেন তোরা এগুতে ও পথে ? স্বীকার করিলাম ভীষণ ভুল হইয়া গেছে; সেটাও বিষয়-লিপ্ত জীব বলিয়াই, পদে পদেই তো আমাদের ভ্রান্তি, এখন ছেলেটিকে বাঁচাইয়া দিন বাবা।

হুকুম হইল—"আগ্ লে আও !"

ছেলেদের মধ্যে তিন চারজন বাড়িতে আগুন আনিতে ছুটিল। ভিড়ের মধ্যে থেকেও কয়েকজন একসঙ্গে দেশলাই বাড়াইয়া ধরিতে সন্ন্যাসী ঘাড়

ফিরাইয়া উগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আবার সেইরকম বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—
"আরে রথ্ দিয়াশালাই, তে ভিড় কেঁও জমায়া ?"



'ঘুঁটের আগুন, অন্য কিছুর নয় !'

চেষ্টা করিয়াও এতক্ষণ লোক সরাইতে পারি নাই, বাবাজীর একটা প্রশ্নতেই সবাই হুড়মুড় করিয়া ফটকের বাহিরে একেবারে রাস্তায় গিয়া

জড়ো হইল। জন দুয়েকের হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্স পড়িয়া গিয়াছিল, ঘুরিয়াও চাহিল না। আমার ছোটভাই—যেটি ডাক্তার—তাড়াতাড়ি ভেতর বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়া অনির্দিষ্টভাবে আদেশ করিল—'ঘুঁটের আগুন, অন্য কিছুর নয়।" ভাবিলাম, ঠিকই ধরিয়াছে, দেশলাইয়ের আগুনে সে ভারতীয় তেজ কোথায়? সন্ন্যাসীও নিশ্চয় সেইজন্যই প্রত্যাখান করিলেন।

বাড়ির ভিতরেও চঞ্চলতা পড়িয়া গিয়াছিল, একটু পরেই ধূপদানিতে আধখানা জলন্ত ঘুঁটে লইয়া আমার একটি ছোট ভাইঝি আসিয়া উপস্থিত হইল; পরনে গরদের শাড়ি।

সন্ন্যাসীকে বৈঠক্‌খানাতেই লইয়া গিয়া বসাইয়াছিলাম। যে-জন্যই হোক আপত্তি করেন নাই। বাহির হইয়া আসিবার সময় দোরটি যখন ভেজাইয়া দিতে গেলাম, মৃদুভাবেই করিলেন আপত্তি, বলিলেন—"আরে দরবাজা কেঁও লাগাতা?" আপত্তিটা না শুনিয়া একটু বিনীতভাবে হাসিয়া বলিলাম—"আপনার বিঘ্ন হবে বাবা, থাক্ ভেজানোই।"

বাহিরে নির্বাক কৌতূহলে সবাই প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় একটা পরিচিত কটু গন্ধে বাতাসটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং আমরা সাহস করিয়া কিছু ভাবিবার আগেই সন্ন্যাসী দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। চক্ষু দুইটি জবাফুল, হাতে প্রায় দেড় বিঘতের একটি ফয়জাবাদী গাঁজার-চিলিম। কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গট গট করিয়া আসিয়া শিষ্যের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কানের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া ডাকিলেন—"আরে প্যারেলাল!! শুনতা নেহি?"

বহুদূর থেকে আবার সেই রকম অতি ক্ষীণ উত্তর ভাসিয়া আসিল—"জী...!" তবে এবার আর একটু স্পষ্ট।

"লে, দম্ লাগা!"

ঠোঁট দু'টি অল্প বিদীর্ণ করিয়া ভিজা-ন্যাকড়া-জড়ানো কলিকাটি মুখে একটু চাপিয়া ধরিলেন।

মিনিট পাঁচেকও লাগিল না, তাহার মধ্যেই রোগী নিজের হাতে কলিকাটি লইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার পর দাঁড়াইয়াও উঠিল।…কৈ, সে রকম রোগাও তো নয় আর!

সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা করিলেন না, শিষ্যকে অনুগামী করিয়া, আমাদের সবার পানে একটা প্রগাঢ় অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া ঋজু পদক্ষেপে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মৎস্য-পুরাণ

১

গিন্নিকে তাড়াতাড়ি কাশী হইতে ফিরিতে হইল। অবশ্য বেশি দিন থাকিবার উপায় ছিল না; কন্যা সুবালা শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছে, আট মাস অন্তঃসত্ত্বা; ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই পূর্ণিমা, আগের পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ, স্নানটা সারিয়া আসিবেন, খবর গেল সুবালা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে।

খুব খানিকটা হৈ-চৈ লাগাইয়া দিলেন। প্রথম ঝোঁকটা গিয়া পড়িল স্বামীর উপর,—"কেন, খবরটা এখন না দিলে চলত না?—যখন দেখছ হয়েই গেল। মাঠে তো পড়ে নেই, বৌমারা রয়েছেন, পাশের বাড়িতেই অভয়ের মা রয়েছে।··তা নয়, এ কুচুটেপনা···বটে! তিথি করবে? গেরণ-স্তান? ···করো গেরণ-স্তান!···"

স্বামী অমৃতলাল রাসপাতলা লোক, খানিকটা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া হুঁকা হাতে করিয়া বাইরে পেয়ারা-তলায় গিয়া বসিলেন।

ঝোঁকটা গিয়া মেয়ের উপর পড়িল—"তোদেরও যেন বাপু তর সয় না, চুলোয় যাক্ দুটো মাস, একটা মাসও তো সবুর ধরে থাকতে হয়—, না হয় দিন কুড়িও ··"। মেজবৌ বলিল—"ঠাকুরঝির কি দোষ মা? হাত তো নেই নিজের···"। "হাতের কথা হচ্ছে না, মা, আক্কেলের কথা হচ্ছে। যাবার সময় দিলে টুকে—'তুমি যাচ্ছ, ভয়ে আমার হাত পা আসছে না মা'।··নাও, ফলল তো পিছু ডাকা?" কন্যা বলিল—"তা গেরণটা নয় সেরেই আসতে।" "গেরণটা তো এগিয়ে আসত না মা আমার জন্যে, আসত কি?—বলো না?"

মার তর্ক কেউ ধরে না, তবু শরীরটা দুর্বল আর অবস্থাটা অসহায়-গোছের, মেয়েয় চোখটা ছলছল করিয়া উঠিল। গিন্নি বলিলেন—"ঐ নাও,

চোখ ডবডবিয়ে উঠল মেয়ের। তর্ক করতে জাননা যখন তর্ক করতে এস কেন মা? কি অন্যায়টা বলেছি? ধিঙ্গি মেয়ে তোমার লম্বা লম্বা পা ফেলে দশ মাসের পথ আট মাসে সেরেছেন ব'লে আকাশের গেরণও তো··· কই দাও।"

বকাবকির মধ্যেই সব গুছাইয়া স্থছাইয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া আসিয়াছেন, চোখের জলে ঠাণ্ডাও হইয়াছেন, আঁতুড়ঘরের দোরের বাইরে বসিয়া হাত দুইটা বাড়াইয়া বলিলেন—"দাও দিকিন, দেখি।"

কন্যা কাঁথায় জড়াইয়া তুলিয়া দিল।

নাতনি হাতে পাইয়া মনটা সরসও হইল।···"এলেন সতীন আমার! একটু যে তিথি-ধম্ম করব তা আর সইলনা!···কেন, এবার তো তিথি-ধম্মেরই পালা আমার; নতুন সোহাগ নিয়ে নতুন ঘরনী এসেছ, আর কি আমার ঠাঁই আছে?···তা রূপ নিয়ে জন্মেছে তোর মেয়ে স্থবু, বাপরে, কী রঙের জুলুস! কী চোখ! কী নাক! তোর মায়ের অন্নজল এবার মারলে স্থবু···"

কন্যা পা ছড়াইয়া বসিয়া ছিল, একটু লজ্জা-গরবের দৃষ্টিতেই আড়ে চাহিয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট কুঁচকাইয়া বলিল—"অত গুমর করে না নাতনির; আমার মায়ের পায়ের নখের সমানও যদি হোত তবু!···"

"দেখিস্, দেখিস্, আগে বড় হোতে দে নাতনিকে আমার, তখন বলিস। মা তখন বেঁচেই থাকবে না যে নাতনির হয়ে ঝগড়া করবার জন্যে।··· কোথায়, দে দিকিন তেলের বাটিটা, মাখিয়ে দিই তেল; রক্তের ডেলা, তবুও যেন খড়ি উঠছে গায়ে মেয়ের! এখন থেকেই আদুনিকা হয়েছেন! শৌখিনী!···দেখাচ্ছি এই শৌখিনী তোমার···"

মেয়ে বলিল—"তেল কোথায় পাবে লোকে মা?"

"তেল কোথায় পাবে মানে?"—গিন্নি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"ওমা, তুমি যে পনেরটা দিন বাইরে গিয়ে নতুন লোক হয়ে এলে গো! তেল কোথায় দেশে?"

"সে কি! তেল পড়ছে না গায়ে?…কচি শিশু, তাও আবার আটাশে, পুরো দশটা মাস মায়ের পেটে থাকতে পেলে না, গায়ে একটু তেল না পড়লে বাঁচবে কি করে? তোরা অবাক করলি যে গো!…বউমা!"

মেজ বধূ আসিয়া দাঁড়াইল।

"একি শুনছি? মেয়ের মাখবার নাকি তেল নেই?"

"তেল তো শহরে নেই মা, দেশে নেই; তুমি যাবার মুখে তবু ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যাচ্ছিল, এখন তাও…"

গিন্নি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন আবার, ভালো করিয়া ঘুরিয়া বসিয়া বলিলেন —"এমন একটু তেল পাওয়া যাচ্ছে না যে শিশুর গায়ে দেওয়া যায়? কেন, রান্না তো হচ্ছে সবার বাকোড় ভরবার জন্যে, তার জন্যে তো তেলের অভাব হয় না!…"

"কোথায় মা? তিলের তেলে একটু সাঁতলে কোন রকমে চালানো হচ্ছে। ভাজাভুজি, মাছ—এসব তো একেবারে বন্ধ।"

"তর্ক করতে জাননা যখন তর্ক কোরনা বাছা; রান্না হচ্ছে বলে ঐ একরত্তি শিশুর গায়ে আমি তিলের তেল তো মাখাতে পারি না, শত্রু নয় তো! ডাকো ওঁকে, তেল আমার চাই যেখান থেকে হোক…"

মেজছেলের ছোটমেয়ে শিউলি ছুটিয়া গিয়া কর্তাকে খবর দিল—"ঠাকুরমা ডাকছেন।"

বাহির হইতে প্রত্যেকটি কথা শোনা যাইতেছিল, কর্তার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, ঘন ঘন তামাক টানিতেছিলেন, রাগিবার চেষ্টা করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া চোখ পাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কে ডাকছে?…ইস্!"

"ঠাকুরমা।…বাঃ, আমি কি করব?"

"বল্, এখন আসতে পারবে না, তামাক খাচ্ছে। ইস্!"

শিউলি ঘুরিয়া ছুটিতেই ডাকিলেন—"কোথায় চললি? শোন্।" কলিকাটা নামাইয়া হাতে দিয়া বলিলেন—"একটু তামাক সেজে রাখ্, একটু বেশি ক'রে।...বললাম তো অমনি ছুটলেন মেয়ে নালিস করতে!" যুদ্ধের পরিণামের জন্য এই ব্যবস্থাটুকু করিয়া গরগর করিতে করিতে উঠিলেন—"ইস্, তীর্থ কেউ করে না! যেন মাথা কিনে..."

—চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলা মিলাইয়া গেল।

গিন্নি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি বলছে এরা? খুকিকে মাখাবো এমন একটু নাকি তেল নেই—এ কি কাণ্ড!"

মেজবৌ কাছে দাঁড়াইয়া, কর্তা যতটা সম্ভব সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন, বলিলেন—"নেই তেল তো বলবে আছে?"

—অবশ্য স্বরটা তুলিতে পারিলেন না।

গিন্নি বলিলেন—"শোন বউমা, উত্তরটা শুনে রাখ একবার।...ঐ কথার ঐ উত্তর হোল? নেই তেল তো-তার ব্যবস্থা করতে হবে না?"

"কোথায় করব?"

গিন্নি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তাও যদি আমায়ই বলে দিতে হয় তো তুমি বাড়িতে বোস ঘোমটা টেনে, আমি কাছা কোঁচা এঁটে বেরুই।...ওসব কথা শুনব না, তেল চাই; নৈলে ঐ দশদিনের মেয়ে সুদ্ধু পোয়াতিকে পাঠিয়ে দাও তার বাপের বাড়ি, তাদের মেয়ে তারা ব্যবস্থা করবেই একটা, 'কোথায় দেখব' বলে পেয়ারাতলায় বসে বসে তামাক টানবে না। দাও পাঠিয়ে, তেলের অভাবে আমি মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারব না..."

সেজছেলে বিমল আসিল,—বিজ্ঞানের ছাত্র, প্রশ্ন করিল—"কি, হয়েছে কি? তেলের কথা কি হচ্ছে?"

"কচি মেয়ের গায়ে তেল পড়ছে না একটু, সমস্ত শহরটায় নাকি এক

ফোঁটা তেল নেই, আমায় এই কথা বিশ্বাস করতে হবে! কেন, তোরাও তো রয়েছিস, পারিস না একটু তেল জোগাড় করতে ?”

শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, সিনেমারও ভক্ত,—বিমল একটা পোজ লইয়া দাঁড়াইল, বলিল—“তেল! ঐটেকে আবার তেল মাখাবে? একে এমনই কাদার মতন হড়হড়ে হয়ে রয়েছে···”

“না, সাবান ঘষে ওপরকার ছালটা তুলে দিই। বকাস নে আমায় বাপু! বলে তেল না মাখালে কচি ছেলের হাড়ই পুষ্টু হয় না, সেই তেল আজ পর্যন্ত এক ছটাক জোগাড় হোল না···”

“নেই দেশে যখন; জোগাড় হবে কোথা থেকে? তা তুমি এক কাজ করোনা, বেশি করে রোদে ফেলে রাখোনা; এমন জিনিস নেই যা তুমি সকালবেলাকার রোদে পাবে না, বেশ ভালো করে গা খুলে দিয়ে···”

গিন্নি আবার জ্বলিয়া উঠিলেন—“তক্ক করতে যখন জানিস না, তক্ক করতে আসিস্‌নি বিমে—সকালবেলার রোদে নাকি সরষের তেল আছে!—আগমে নিগমে কেউ যে কথা শোনেনি। আছে তো যা, বাপে-বেটায় মিলে ঘানি ঘুরিয়ে রোদ থেকেই তেল বের করে দে আমায়, তেল আমার চাই।”

২

অনেক কষ্টে জোগাড় হইল একটু তেল। বাড়ির পাচক-ঠাকুর একটা পাইন্ট-বোতলের এক বোতল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল, বলিল, তাহার দূরসম্পর্কের এক ভাই জেল আফিসের বাবুর বাড়িতে রাঁধে, সে-ই বাবুকে বলিয়া-কহিয়া জোগাড় করিয়া দিয়াছে, জেলের ঘানির খাঁটি তেল।··· ইচ্ছা হইল ঠাকুরেরই ঘানি টানাইবার ব্যবস্থা করিতে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে দুইটি টাকা দিয়া তেলটুকু লইতে হইল। যাই হোক, নাতনির হাড়ের পোষ্টাই পাইয়া গিন্নি ঠাণ্ডা হইলেন, সবার হাড়ে বাতাস লাগিল। বোতলটা রহিল মেয়েরই জিম্মায়, আঁতুড়-ঘরের অশুচিতার দুর্ভেদ্য দুর্গে। সকালে

গিন্নি নিজেই ছোট মেয়ের আটহাতি ডুরেটা পরিয়া নাতনিকে উলটাইয়া পালটাইয়া তেল মাখান, তৈল-কীর্তনের সঙ্গে আধুনিকাদের সাবান-সেন্টের মুণ্ডপাত করেন ; তাহার পর নাতনিকে রোদে শোওয়াইয়া স্বামীকে ডাকাইয়া তৈলসঞ্চয়ের কথা মনে করাইয়া দেন,—ওটুকু তেলের আর কতটুকুই বা পরমায়ু? ফুরাইয়া যাইবার আগেই যেন হাজির হয় তেল—বাজে কথা শোনা হইবে না। কর্তা হাতে হুঁকা এবং মাথায় দুশ্চিন্তা লইয়া পেয়ারা-তলাটিতে গিয়া বসেন। এই করিয়া দিন-চারেক কাটিল।

পঞ্চম দিনে ঐ সামান্য তেলটুকুরও শনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সকাল বেলা। দলে পড়িয়া গিন্নি তারকেশ্বর গেছেন, ফিরিবেন সন্ধ্যার পর। কর্তা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরের রকে বসিয়া পাড়ার কয়েকজন সমবয়সীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। একাল আর সেকালের গল্প, প্রায় সমস্তটাই সেকালের তেল আর একালের তেল লইয়া, এমন সময় একটি সের-ছয়েকের মাছ বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

পাড়ার মধ্যে মণিলালের মাছধরার শখ অত্যন্ত প্রবল, মাছটা রকের উপর ধড়াস করিয়া ফেলিয়া সবার বিস্মিত মুখের পানে বিজয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"ব্যাটরার সা'য়েদের পুকুরের মাছ ; মাছ কোথায় তার ঠিক নেই—সের-ছয়েকও হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু কী নাজেহালটা করে ছাড়লে—দু'টি ঘণ্টা—এক মিনিট কম নয়! বঁড়সি ঠোঁটে করে সমস্ত পুকুরটা চষে ফেললে, দেখলে মনে করতেন বুঝি আধমুনে একটা কাৎলা গেঁথেছে! ব্যাটরার সা'য়েদের পুকুরের মাছের ঐ পিকিউলিয়ারিটি কিনা—আধমোন-তিরিশসের পর্যন্ত মাছ আছে—একটা-আধটা নয়, কিন্তু সের চারেকের বেশি কেউ তুলতে পারেনি আজ পর্যন্ত—ভয়ানক খেলোয়াড়—প্রত্যেকটি মাছ···"

মাছ ধরিতে যতটা পারুক না পারুক, বেশ রস দিয়া গল্প করিতে পারে মাছের। এর পরে ব্যাটরার সা'য়েদের পুকুরের মাছের স্বাদিষ্ঠতার কথা তুলিল—ও-তল্লাটে অমন সুস্বাদু মৎস্য নাকি নাই। মণিলালের দম ফুরাইয়া

আসিলে অন্যেরাও যোগ দিল—মাছ কি করিয়া রসনার উপযোগী করিয়া তোলা যায়···এই যে মাছটা, ছ'সেরের একটা রুই—এটা ভাজায় কি রকম



হইবে, ঝোলে কি রকম, ঝালে কি রকম, কালিয়ায় কি রকম, অম্বলে কি রকম। মাসাবধি প্রায় কাহারও মাছের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অগ্নিমূল্য, তাহার উপর আবার এদিকে তৈলাভাব। মণিলালের মাছটিকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা মুখর হইয়া উঠিল। এক সময় মণিলাল বলিল—"তা তো হোল,

এখন কে কতটা নেবেন বলুন, কেটে পৌঁছে দিই। আমার তো সেরখানেক হলেই ভেসে যাবে। আর—মাছ ধরে এনে যদি একলাই খাব তো তেমন মাছ ধরার দরকার ?···আমি তো এই বলি।”

গোবিন্দলাল কখনও হাত তুলিয়া কাহাকেও কিছু দিয়াছিলেন এমন মনে পড়ে না কাহারও, তাঁহার ছেলে মণিলালও বাপের সুযশ বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। আজ যে সে হঠাৎ উদার হইয়া উঠিল কেন, সবাই বুঝিলেন। সবার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরদাদার সম্বন্ধ, ঘুটু চক্রবর্তী একটু মুখফোঁড়ও, বলিলেন —“সব তো বুঝলাম ভায়া, কিন্তু যাঁর অভাবে তুমি মাছটিকে একলা খেতে পাচ্ছ না, তিনি যে আমাদেরও ভাঁড় শূন্য করে রেখেছেন, মাছ বাড়িতে ঢুকিয়ে কি করব বলো ? কাঁচাও খেতে পারব না, সেদ্ধ করেও খেতে পারব না ; একদিন তিলের তেল চেষ্টা করে দেখেছিলাম—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। লোভ তো হচ্ছে, অমর্ত-ভায়ার মুখে এত জল এসেছে যে হুঁকোয় টান দিতেও পারছেন না—দেখছি তো বসে তখন থেকে, কিন্তু করা যায় কি ? ···কি গো অমর্ত, ভাঁড় উলটুলে বেরুবে এক আধ ফোঁটা ? তাহলে দেখনা একবার, নাতি আদর করে আনলে এমন সওগাৎটা। আমার ভাঁড় তো ফাটছে।”

সব ভাঁড়ারেরই এক অবস্থা, সবার মুখেই এরকম সখেদ প্রত্যাখ্যানের কথাই বাহির হইল, মাছটি আত্মনিবেদন করিতে আসিয়া এমন ভাবে ফিরিয়া যাওয়ার পর আসরও সেরকম জমিল না আর, সবাই একে একে উঠিয়া গেল।

৩

মাছটা সামনে হইতে সরিয়া যাইতে কর্তার মুখের জলটা অনেকখানি শুখাইয়া আসিল, চিন্তিত ভাবে খানিকক্ষণ ধীরে ধীরে তামাক টানিলেন, তাহার পর টানগুলা দ্রুত হইয়া আসিল, ক্রমে আরও দ্রুত, তাহার পর এক সময় উঠিয়া পড়িলেন।

লোভ লজ্জা ভয় কুণ্ঠা সব জড়াজড়ি করিয়া এক সঙ্গে কখনও এমনভাবে আসিয়া পড়ে নাই জীবনে এর আগে। চার পা আগান তো দুইপা পিছান, এই করিয়া করিয়া মিনিট পাঁচেক পরে মেয়ের আঁতুড়ঘরের সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গলাটা পথেই পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন ; নিম্নলিখিত কথাবার্তা হইল—

"কি গো সুবু, আছিস কেমন মা ?"

"বেশ আছি বাবা।"

"গিন্নি নেই কিনা, তাই ভাবলাম দেখে আসি একবার। ঐ এক বেয়াক্কেলে মানুষ ; এই তীর্থে যাবার সময় হলো তোমার ? তীর্থ তো পালাচ্ছিল না।"

"বেশ করেছেন বাবা, একটু ঘুরে আসুন ; খালি নাতনি—নাতনি—নাতনি·· নাতনি যেন কারুর হয় না !···"

"আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি তো ? তোরা আর কি বুঝবি ? আগে হোক নাতি নাতনি।···তা আছেন কেমন ইনি ?···ইস্, রূপ হয়েছে দেখো শালীর ! একেবারে রূপকথার পরী !"

সুবু একবার আড়চোখে লজ্জিত গরবে কন্যার পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—"আছেন ভালোই, দুবেলা দিদিমার হাতে খাবলা খাবলা তেল মালিশ হচ্ছে, অথচ শহরে একটু ভাজা-চচ্চড়ির জন্যে তেল জোটে না কারুর—এত তোয়াজেও যদি ভালো না থাকেন···"

"এই দেখো ! ভুলেই গেছলাম, তোর তেলের কথায় মনে পড়ে গেল, —তেল আর আছে কতটুকু বল্ দিকিন।"

মেয়ে মাথা নিচু করিয়া অল্প একটু হাসিল।

"হাসছিস যে ?"

মেয়ে গলা খাটো করিয়া বলিল—"তেল এখনও আছে বাবা, তুমি ভেবো

না, তবে চেষ্টাটা করতে থেকো। খুকিকে যে তেল মাখান সেটা খাঁটি সরষের তেল ভেবেছ নাকি ?"

—বাপের মুখের পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিল।

"তবে ?"

মেয়ে গলাটা আরো খাটো করিল—"বয়ে গেছে আমার খাঁটি সরষের তেল বের করে দিতে! তোমায় রোজ ধমকান্, আর আমি তেলটুকু শেষ করে দিই আর কি। কোথায় তেল পাবে তুমি শুনি—কলুর মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে ?"

—মাকে নেপথ্যে ঠাট্টাটুকু করিয়া মেয়ে আবার মিটি-মিটি হাসিতে লাগিল, কর্তা একটু আগাইয়া গেলেন, গলা নামাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"তবে করিস কি শুনি ?"

"খানিকটা তিলের তেল আনিয়ে রেখেছি চুপি চুপি, বাটিতে সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিই, বেশিটা তিলের ; হলুদটা আমিই দিই গুলে, আর টের পান না।"

কর্তা একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"তিলের তেল যে ঠাণ্ডা, বাতে ধরবে যে মেয়েকে রে পাগলি !"

"হিং চাটাই যে তেমনি !···"

গিন্নির হার হইতেছে, বোধ হয় এই আনন্দেই কর্তাও একটু হাসিয়া ফেলিলেন, তাহার পর গম্ভীর হইয়া একটু ধমকের সুরেই বলিলেন—"না, অমন পাগলামি করবি না। মেয়ের শরীরের কথা, তেল না হলে হাড় পুষ্ট হয় না, সরষের তেলই দিতে হবে···"

"ওমা, তুমিও যে মার মতন অবুঝ হলে বাবা! পাব কোথায় অত সরষের তেল আমি যে···"

"পাবি ; সে-ভাবনা তোর নয় তো, সে ভাবনা আমার। তেল একটু জোগাড় হবে না তো এ-হ্যাঙ্গামাটা করলাম কেন ?"

মেয়ে মুখের পানে একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল, বাবার প্রকৃতিটা জানে, একটু ভীতভাবেই প্রশ্ন করিল—"হ্যাঙ্গামা আবার কি করলে বাবা ?"

"হ্যাঙ্গাম বৈ আর কি বলব ? মণিলাল ব্যাঁটরার সা'য়েদের পুকুর থেকে একটা রুইমাছ ধরে এনেছে—ছ'সেরের..."

একবার আড়চোখে ফিরিয়া চাহিলেন, মেয়ের দৃষ্টি লুব্ধতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে...

"পাক্কা ছ'সেরের মাছ! সা'য়েদের পুকুরের মাছ আবার ভয়ানক মিষ্টি কিনা···কিন্তু তেল কোথায় ?..."

"ও বাবা, তুমি নিলে না অমন মাছটা ?"

"শোন্ স্থির হয়ে সবটা। মণিলাল বললে—ঠাকুর্দা, কতটা দিই ? আমি বললাম—মাছ তো দেবে কিন্তু তেল কোথায় ? মাছ তো আর কাঁচা খাওয়া যাবে না, তা সে সা'য়েদের হাজার ডাকসাইটে মিষ্টি মাছ হোক।....তখন মণিলালই বললে—তেলের ভাবনা ? কত চান আপনি ?···তা যদি জোগাড় হয়, তো দাও সের খানেক মাছ কেটে ; তাই গেছে কেটে নিয়ে আসতে।"

মেয়ে একটা ঢোঁক গিলিল, লজ্জিত মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"একটা কথা বলব বাবা ?"

"বল্‌না, কথা বলবি তার এত ইয়ে কেন ?"

আবদারে মুখটা মেয়ের ভার হইয়া উঠিল, মাথাটা একটু দোলাইয়া বলিল—"আমিও একটু খাব বাবা, হুঁ···আমায় মা খালি উপোস করিয়ে রেখেছেন—এটা খেলে এই হবে, ওটা খেলে তাই হবে—শুধু ঝালনাড়ু আর চিঁড়েভাজা খেয়ে থাক্,—না, আমি খাব মাছ।"

"তা খাবি, মাছে আর কি হয়েছে ? বোধ হয় মাছ পাওয়া যায় না, তেলের অভাব, তাই হয় না, নৈলে মাছে আর কি দোষ হয়েছে ?"

"আর একটা কথা, বাবা।"

"কি বল্ না।"

"আমায় খান কতক ভাজা মাছ বেশি করে দিও, লুকিয়ে রেখে দোব, কাল পর্যন্ত হবে আমার।"

"তা দোব। এ আর এমন ভারি কথাই বা কি, দোষেরই বা কি ?"

মা কড়া বলিয়া বাপে-মেয়েয় এরকম লুকাচুরি নূতন নয়, সুবালার হাসি-হাসি ভাবটা আবার ফিরিয়া আসিল; প্রশ্ন করিল—"তা তেল কতটা পেলে বাবা ?"

বাপের মুখের হাসি-হাসি ভাবটা বিলুপ্ত হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে, বার দুয়েক ঢোঁক গিলিতে হইল, তাহার পর আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"তেল পেলুম মানে—তা সে পাওয়ারই সামিল—মণিলাল যখন বলেছে, ধড়িবাজ ছেলে—অন্তত সেরখানেক তেল তো করবেই জোগাড়···কাল হোক্, পরশু হোক...."

"এখনও হয়নি জোগাড় ? তাহলে কিসের ভরসায় মাছ নিয়ে বসে আছ বাবা ? এক্ষুনি তো আসবে নিয়ে।"

কর্তা অনেক মহলা দিয়া অনেকবার গলা পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছিলেন, মোক্ষম কথাটি কিন্তু মুখ দিয়া আর কোনমতেই বাহির করিতে পারিলেন না। দুই তিনটি ঢোঁক গিলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। মেয়ের মুখে একটু হাসি ফুটিব ফুটিব করিয়া মিলাইয়া গেল, প্রশ্ন করিল—"একটা কথা বলব বাবা —শুনবে ?"

"কি বল্ না, একটা কথা বলবি তার আবার এত আড়ম্বর কেন ?"

"খুকির মাখবার তেলটুকু দিই বের করে; কাল পরশু পর্যন্ত তো এসেই যাবে বলছ তেল। কথাটা কিন্তু কাউকে জানিয়ে কাজ নেই।"

কর্তা একটু রাগিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, জানিয়ে তোকে বকুনি খাওয়াই আর কি, আমার তো আক্কেল নেই। বললেই হবে, মণিলাল জোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু কচি মেয়ের মাখবার তেল···তা দে, কাল তো আসছেই

সের-খানেক; মোদ্দা, দিন-তিনেকের হাতে রেখে দিবি, ছেলেমানুষি করবি নি।”

একটু ঢালিয়া রাখিয়া বোতলটা সঙ্গোপনে বাহির করিয়া দিতে দিতে কন্যা আবার আবদার করিয়া বলিল—“খানকতক কিন্তু আমার জন্যে ব্যবস্থা করে দিতে হবে বাবা। তুমি আবার বড্ড ভুলে যাও…”

৪

মণিলালের কাছে তেলের কথা তোলাই চলিল না। তাহার বাসায় যাইতে সে-ই বরং এক সেরের জায়গায় সের-দুয়েক মাছ গছাইয়া দিয়া, একটু লজ্জিত-ভাবেই প্রশ্ন করিল—“কিন্তু তেল কোথায় পেলেন ঠাকুর্দা? দিন্ না আমায় ঠিকানাটা বাৎলে, যেমন অবস্থা দেখছি, একসের ছেড়ে আধসেরও মাছ রাখা চলবে না বাড়িতে; কেউ নিতেও তো চাইছে না—মাছ যেন এক জ্বালা হয়েছে…”

নিদারুণ তৈল-চিন্তার মধ্যে সা’য়েদের পুকুরের ডাকসাইটে মাছের স্বাদটা কত খুলিল ঠিক বোঝা গেল না; তবে মাছ খাইয়া যে শক্তিটুকু হইয়াছিল অথবা হইবার কথা, তাহার দ্বিগুণ শক্তি তৈল অভিযানে ব্যয়িত হইয়া গেল। কোথাও তেল পাওয়া গেল না, যে-সব ব্যূহের মধ্যে আছে তেল বলিয়া ভাসাভাসা খবর পাওয়া গেল, সে-সব ব্যূহে প্রবেশ করিবার মন্ত্র অমৃতলালের মতো মানুষের জানা না থাকিবারই কথা।

পরদিনের সকালটি যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল, কর্তার হাতপা ততই পেটের মধ্যে সাঁদাইয়া যাইতে লাগিল। আঁতুড়ঘরের দিকটাই ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া দিলেন।

রাত্রি আন্দাজ ন’টার সময় গিন্নি তারকেশ্বর হইতে ফিরিলেন। ততক্ষণে কর্তা আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মনে মনে একটা প্ল্যান আঁটিয়া ফেলিয়াছেন, অনেকটা নিশ্চিন্ত। পেয়ারাতলায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, একটু ব্যঙ্গের স্বরেই প্রশ্ন করিলেন—“হোল তীর্থ?”

বেশ বোঝা যায়, যেন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করার ভাবটা, অথচ এ সাহস কর্তার বড় একটা হয় না। গিন্নি বাড়ির প্রবেশের মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ এরকম অভ্যত্থনা ?—একটা মানুষ সমস্ত দিন পরে ফিরল।···আর তিথি নিয়ে ঠাট্টা কি ?"

"ঠাট্টা নয়, একটা মেয়ে আঁতুড়ে পড়ে রয়েছে, তা হলে আমিই বা কি দোষ করেছি, যাই না একবার বদ্যিনাথ থেকে আসি না ঘুরে।"

গিন্নি গলা ছাড়িয়া দিলেন—"তা যাও, এসো ঘুরে! কুড়ে মনিষ্যি, কখনও তো নাম শুনলাম না মুখে তিথের, আমার হিংসেয় যদি হয়েই থাকে সুমতি, যাওনা! কে মানা করছে—আর ভয় দেখানোই বা কিসের ?"

ঝগড়াটা মুখে করিয়াই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

গিন্নির সহিত সমানে ঝগড়া করিয়া যান এমন ক্ষমতা নাই কর্তার, তবে মাঝে মাঝে ফোড়ন দিয়া একতরফা ঝগড়াটা জিয়াইয়া রাখিলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল যে, সবাই বুঝিল একজন শান্তিপ্রিয় লোকের এ গঞ্জনার মধ্যে কাল-কাটানো একেবারে অসম্ভব।

ছেলেরা একটু চাপা গলায় মাকে একান্তে বলিল—"একটা সামান্য কথা নিয়ে অত বকাবকি করছ কেন মা, শেষকালে বাবা বোধ হয় মনের দুঃখে সত্যিই যাবেন বেরিয়ে।"

বৌয়েরা একটু চাপা গলায় শ্বশুরকে একান্তে বলিল—"না হয় আপনি একবার ঘুরেই আসুন বাবা, নইলে ওঁর বকুনি এখন চলবে এই রকম ; যান, বাবা বৈদ্যনাথ নিশ্চয় টেনেছেন, নৈলে মুখ দিয়ে বেরুত না কথাটা।"

* * *

সযত্নে এই জনমতটুকু গঠন করিয়া লইয়া কর্তা তাহার পরদিন সকালেই —গিন্নি পা ছড়াইয়া নাতনির তৈলচর্চায় বসিবার পূর্বেই—বৈদ্যনাথ-ধাম যাত্রা করিলেন।

মন্তর

স্বরূপ মণ্ডল বলিল—"মন্তর যে আজকাল আর ফলচেনি এ-কথা একবার কেন একশ বার মানব, দাদাঠাকুর, কিন্তু মন্তর নেই বা কখনও ফলেনি, একথা কি করে মেনে নিই, বলুন না।....সেই তক্ক করতে এসেছিস আমার সেথে, ঐ অখিল গুঁইয়ের ছেলে, দু'কলম ইঞ্জিরি পড়েচে ··আপনাকে এস্‌তে দেখে ন্যাজ মুখে করে ঐ সটকালো।....কেন, মন্তর নেই তো গ্যাঁট হয়ে বসে রইলিনি কেন!" ছেলেটি এবার স্কুল থেকে পাশ করিয়া কলেজে গেছে, দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়াছে, একাল-সেকাল লইয়া মাঝে মাঝে স্বরূপকে ঘাঁটাইয়া যায়।

একটা বাঁখারি চাঁচিতেছিল, দা'য়ের একটা লম্বা টান দিয়া মুখটা হাঁ করিয়া আমার দিকে একটু বাড়াইয়া দিল স্বরূপ, তাহার পর বলিল—"এই দেখুন, একটু গুড়ুকের ধোঁয়া গিলতে মনে হয় কি কঠিন বস্তুই না মুখের মধ্যে ঢুকল, অথচ এমন দিনও তো ছেল দাদাঠাকুর, য্যাখন আধমুনি কাৎলার মুড়োগুলো ছাতু হয়ে গ'লে গেছে এই মুখে ?···বলুন ?"

—মন্ত্রশক্তির বড়াই নয়; স্বরূপের একটা নিজস্ব উপমা, দন্তশক্তির নজির দিয়া মন্ত্রশক্তির কথাটা পরিষ্কার করা। আমার অভ্যাস হইয়া গেছে, ভাষার যতই খুঁৎ থাক্, উদ্দেশ্যটা নিখুঁৎভাবে বুঝিতে আর আটকায় না। অখিল গুঁইয়ের ছেলের উদ্দেশে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলাম—"সত্যিই তো, আজ নেই বলে কি বলতে হবে, দাঁতগুনো ছিলই না মুখে কোন কালে ?"

বুঝিবার এবং বিশ্বাস করিবার লোকের পৃথিবীতে একেবারে অভাব পড়িয়া যায় নাই দেখিয়া স্বরূপের মুখটা ধীরে ধীরে প্রসন্ন হইয়া আসিল। বাঁখারিটা একবার চোখের কাছে ধরিয়া এমুড়ো ওমুড়ো দেখিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া দিল, একটু হাসিয়া বলিল—"উই সুমুস্তিরই গুলতি হচ্ছে; ইদিকে

যে আবার লাতি হয় সম্পক্কে, বুঝলেন না ?···রন্, একটু তামুকের ব্যবস্থা করি আপনার।"

উঠিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম—"এরা সব গেল কোথায় ?"

"বলছি সে কথা, এসি আগে।"

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হুঁকাটা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—"উই থেকেই তো কথাটা উঠল। বিলাস বাউরির পরিবারের উপর ভূতের ভর হয়েচে ; সবাই জানে ওর শাশুড়ি মাগির সঙ্গে বনত না, সে মরে মাঝে মাঝে নামে এখন ওর দেহে ; সেপাই দারোগা হয়ে উঠলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয় না দাদাঠাকুর ?·· সেই রকম আর কি। কিন্তু বিলাসের এখন ট্যাকা হয়েছে, একটা পাশ-দেওয়া জামাই করেছে, ওসব সেকেলে কথা মানলে তো মর্য্যেদা থাকে না আর, ডাক্তার ডাকিয়ে বোয়ের চিকিচ্ছে হচ্ছে। এরা সব তাই দেখতে গেছে ঝেঁটিয়ে।·· মাগি ঝড়ের মতন বক্তার করে যাচ্ছে কিনা, হোমরা-চোমরা একটা স্বদেশী বাবু সামনে দাঁড়াতে পারবেনি দাদাঠাকুর।"

স্বরূপ মণ্ডল হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আমার মুখের পানে চাহিল, দৃষ্টিতে কিছু মন্তব্যের প্রত্যাশা দেখিয়া বলিলাম—"তা না হয় একটা রোজাই ডাকুক।"

একেবারে মনের মতো অভিমত পাইয়া স্বরূপ আরও একটু উল্লসিত হইয়া উঠিল অন্তরে অন্তরে, জমির উপর একটা আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল—"আমি তাও বলিনে দাদাঠাকুর, আমি বলি—কাজ নেই তোর ওসব সেকেলে পাঠ প'ড়ে, কিন্তু তোর বোয়ের যদি ইষ্টিরিয়াই হয়েচে তো তোর ডাক্তারে রোগের ইষ্টি করুক,—হালে পানি পায় না কেন ? চেরা-ফোঁড়া শুনচি কিছু বাদ যাচ্চেনি, ক'দিন থেকে, বউ কিন্তু তার এখনও বক্তারের চোটে এমন বাড়ি খালি ক'রে লোক একট্টা করচে কেন যে অতিথি বাহ্মণকে মান্যে এক চিলিম তামুক দেবে তার ব্যবস্থা নেই ? কথাটা অন্যায় বলে থাকি, আমার যা সাজা দেন দাদাঠাকুর।·· দেন, একটু পেসাদটা পেয়ে নিই।"

খানিকটা বকার পর মনটা খোলসা হইয়াছে, তাহার উপর একটু ধোঁয়াও গেল পেটে, স্বরূপ আমার হুকার মাথায় কল্কিটা বসাইয়া দিয়া বাঁখারিটা আবার একবার সেইভাবে আগাগোড়া দেখিয়া লইয়া ভূমিতে নামাইয়া একটু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু তা তো ব্যাপার নয় দাদাঠাকুর, ব্যাপার হচ্চে অন্যরকম। ও-বাড়িতে রোজা তো আর ঢুকতে দেবেনি, তা সে ভূত ঝাড়াবার জন্যেই হোক, চাই সাপের বিষ ঝাড়াবার জন্যেই হোক। রোজা আব ও বাড়িতে ঢুকতে পাবেনি।"

আবার মাথা নিচু করিয়া বাঁখারি চাঁচা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং তাহারই মধ্যে সূক্ষ্ম তির্যক দৃষ্টির সঙ্গে ঠোঁটে খুব ক্ষীণ একটু হাসি লইয়া আমার পানে এমনভাবে কয়েকবার চাহিল যে, বোঝা গেল বেশ একটি গল্প জমিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম—"বলতে বাধা আছে নাকি মণ্ডলের পো'র? তাহ'লে না হয় থাক্।"

স্বরূপ বলিল—"বাধা আর তেমন কি দাদাঠাকুর? গেরস্ত-বউয়ের কেচ্ছা একটা, পাঁচ কানে তো তোলা যায় না, তাই—আপনারা ভদ্দরলোকরা যাকে বলেন—একটু কুন্ঠা হচ্চে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বাধাটা নিতান্ত কম বলে মনে হচ্ছে না আমার স্বরূপ, ও থাক্ই তাহ'লে; তুমি বরং......"

স্বরূপ নিজের কথার জের টানিয়াই বলিল—"আবার তাও ভাবি—আপনকার হোল বামুনের কান, গঙ্গাজলের মতন শুদ্ধু, দোষ থাকে, দুধের ছ্যানার মতন কেটে যাবে। গল্পটা আরম্ভ করলাম, শেষ করবনি, আধ-কপালের হিড়িক কে সামলাতে এসবে? ও বলেই থুই।"

দা বাঁখারি রাখিয়া হাঁটু দুইটা জড়াইয়া বসিয়া স্বরূপ আরম্ভ করিল—"সে আজকের কথা নয় দাদাঠাকুর, নেহাৎ কম করে ধরলেও দেড় কুড়ি বছরের কম হবেনি! বিলাসের মার ত্যাখন বয়েস হয়ে এয়েচে—আমার

চেয়ে বছর দশেকের বড়ই ছেল—কিন্তু দজ্জালপনায় তখনও সারা মসনেয় না হোক, মসনে-দক্ষিণপাড়ায় ফাষ্টো যাচ্ছে। অধম্মের ভয়ে, সারা মসনেয়—বলতে পারচিনি দাদাঠাকুর, কেননা চাটুজ্যেপাড়ায় ত্যাখনও অরাতি ঠাকুরের পিসি সজ্ঞানে বেঁচে। তিনি আবার ঝগড়ার মধ্যে মাথার বেম্মতল ফেটে মহাপ্রাণী বেইরে গিয়ে মারা যায়—পুণ্যবতী মানুষ ছেল, তানাদের যুগই গেচে চ'লে। তাহ'লেও দক্ষিণপাড়াতেও সবার ওপর টেক্কা দেওয়া ত্যাখন চাড্ডিখেনি কথা নয় দাদাঠাকুর—ত্যাখনও যদুপালের খুড়ি বেঁচে, পাড়ায় অষ্টপহর রাজস্থূয় যজ্ঞির হট্টগোল লেগে থাকত।

"কুঁদুলে মেয়েমানুষকে বিধেতা পুরুষ তিনভাগে বেঁটে দিয়েছেন দাদাঠাকুর, নৈলে একঘেয়ে হয়ে পড়ে কিনা; এক—যাকে মেয়েলি কথায় বলে ঘর-জ্বালানী—পাড়াভালানী; মানে পাড়াপড়শিদের অষ্টপ্রহর ভালো করে বেড়াচ্চে—কার মেয়ে পর্শ হবে, কার কচি ছেলের সান্নিপাতিক, কার বাড়িসুদ্ধ্যু জ্বরের ধকল, সাবুটি করে দেয় এমন লোক নেই—সামলে বেড়াচ্চে, মুখে রা নেই; বাড়ি এলেই কিন্তু সেই মানুষ অগ্নিশম্মা, কাকচিল বসবার জো নেই। দু' নম্বরের মধ্যে হোল উরই উল্ট, ঘরভালানী—পাড়াজ্বালানী; নিজের পুনিকে পাখির মতন বুকে করে সামলে আচে, দরজার বাইরে পা দিয়েচে কি একেবারে অন্য মানুষ। বিলাসের মা ছেল তিন নম্বরের মধ্যে —য্যাতক্ষণ বাড়িতে থাকত বিলাসের বাবা সাধনখুড়ো থেকে বাড়ির কুকুর বেড়ালটা পজ্জন্ত তটস্ত হয়ে থাকত। অষ্টপহরই মুখ চলচে—এই সোয়ামীকে নিয়ে, তারপরেই হয়তো ছেলেমেয়েদের কাউকে নিয়ে, তার জের টেনেই হয়তো বউকে নিয়ে; সেই সাত-সকালে উঠোনে গোবরজলছড়া দেওয়া থেকে এতটুকু কামাই নেই। সাধনখুড়ো বছরে বার তিন চার করে বিবাগী হয়ে যেত; তবে অনবরত কাঁসর-ঘণ্টার মধ্যে থেকে কেমন একটা অব্যেস হয়ে গেছল, টেঁকতে পারতনি; বাবার স্যাঙাৎ ছেল—দুঃখু করে বলত, কি করি, বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অদেষ্টের নেকন আর কি দাদাঠাকুর।

"এই ছিল ঘরের অবস্থা, সাটে বললুম আপনাকে। চৌকাটের বাইরে পা দিলে, তো পাড়ায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড পড়ে গেল। রাঙাখুড়ির (আমরা ভয়ে-ভক্তিতে তাই বলে ডাকতুম)—রাঙাখুড়ির পদ্ধুতি ছিল অনেক রকম। এমনি বাড়ির ঝগড়াটা মুখে করেই বেরুত বাইরে, কেউ যদি একটু টুকলে তো তার সঙ্গে লেগে গেল ; কেউ যদি শুনেও না শুনলে—সেই চেষ্টাই সবাই করত দাদাঠাকুর—তো তার সঙ্গে আরও তাড়াতাড়ি নেগে যেত—এমন পাড়া শ্মশান হয়ে যাক্—কেউ একটা দুঃখের কথা ডেকে জিগ্যেস করে না এ-পাড়ায়, শুনলে কালা সেজে বসে—প'চে গ'লে যাক্ এমন কান···নাম করতনি দাদাঠাকুর, ভুলেও নয়, কিন্তু এমন আঁতে ঘা দিয়ে মোক্ষম মোক্ষম কথা বলত, আর এমন তাক ক'রে যে, কার সাধ্যি ঘুরে একটা জবাব না দেয় ? তারপরেই ব্যস, একটার সঙ্গে জড়িয়ে আর একটা, তারপর আর একটা, দেখতে দেখতে সমস্ত পাড়াটা গমগম করে উঠত। এর সঙ্গে যদি যদু পালের খুড়ি, কি জগা বাউরির সৎমা, কি লক্ষ্মণের জেঠাই সরিক হয়ে পড়ল, তো শুনুন না কত শুনবেন বসে বসে।···হুঁকোটা একবার কাৎ করুন দাদাঠাকুর, সে-সব কাহিনী বলতে গেলেও দম ফুরিয়ে এসে।"

বেশ ভালো করিয়া গোটাকতক টান দিয়া স্বরূপ কল্কিটা আবার আমার হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"কেউ ফেরেনি এখনও।···তা এখুনি ছেড়ে যাবে সে বুড়ি ? শেষ পজ্জন্ত নেশানা নিয়ে কেটেছেল, ভুলতে পারে কখনও সে কথা দাদাঠাকুর ?"

প্রশ্ন করিলাম—"সেটা আবার কি ?"

"সেই কথাই তো বলচি দাদাঠাকুর, কিন্তু একটু গোড়া বেঁধে না বললে তো বুঝবেননি। বিলাসের পেরথোম বউটি ছেল বড় ভালোমানুষ, গোড়া-থেকেই ঐ রকম পাড়াকুঁদুলি বউকাঁট্কি শাশুড়ির পাল্লায় প'ড়ে আর ফণা ধরতে পারলেনি কখনও, চেরকালটা চাপাই রয়ে গেল। অবশেষে যখন

বড় হোল, জ্ঞানগম্যি হোল, ভালোমন্দ বুঝতে শিখলে, একদিন আপ্তহত্যে করে শাশুড়ির হাত থেকে এড়িয়ে গেল। বিলাসের ত্যাখন বয়েস হয়েচে, দুঃখে ঘেন্নায় আর বিয়ে করতে চাইলেনি। বছরখানেক কাটালে—একবার বিবাগী হয়ে বাপের মতন ঘুরেও এল, তারপর অতিষ্ঠ হয়ে এর ওর মুখ দিয়ে বাপকে জানিয়ে দিলে—আর এক দণ্ড বাড়িতে টেঁকতে পারচে না, বিয়ে দিক তো দিক, নইলে সেও বোয়ের মতন আপ্তহত্যে করে সব জ্বালা জুড়োবে। কথাটা বুঝলেন না দাদাঠাকুর? এতদিন বাপে বেটায় আর বোয়ে মিলে মায়ের ধকলটা কোন রকমে সামলাচ্ছেল, ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছেল তো? বরং বোয়ের ওপর দিয়েই যাচ্ছেল বেশির ভাগটা, এখন সে সেয়ানার মতন পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিতে দুজনকেই সবটা ঘাড় পেতে নিতে হচ্ছে। খ্যামতার বাইরে হয়ে পড়ছেল; তার ওপর বাবা আবার মাঝে মাঝে বেইরে যেত, তখন সমস্তটা ওর একার ঘাড়েই পড়ত তো?···বাপ একবার বিবাগী হয়ে ফিরে এসতে একে-ওকে দিয়ে জান্যে দিলে, বিয়ে দেবে তো দাও, নইলে আম্মো বোয়ের পথ দেখব।

“মাগি তো খুঁজছেলই, আজ হলে কাল চায় না, বউ দাঁতে পেষা—তার তো এক আলাদ স্বদই? তার ওপর ছেলের শ্বশুরবাড়ির গোটাকতক লোকও পাওয়া যায়, একটা উপরি-পাওনা,—একদিন ঘটা করে বিলাসের বিয়ে হয়ে গেল।

“বউ এল এই নারানী, পঞ্চাননতলার সাধু বাউরির মেয়ে। দিব্যি ডাগর-ডোগর বউ, হাড়কাট গুনো মোটা, পা দু’খানা ভারী, হাঁটার মধ্যেও একটা পুরুষালি ভাব, যেন যাত্রার দলের বিশাখা-সখী। নানান লোকে নানান কথা বলতে লাগল; কেউ বললে, এইবার মাগির বিষদাঁত ভাঙল, এই বোয়ের সঙ্গে কচালি করতে গেলে কোন্‌দিন দেবে সাবড়ে; কেউ বললে, আর যাই হোক, পাড়া এবার ঠাণ্ডা হবে, বউ একটু তোয়ের হয়ে নিক, বাড়ি ছেড়ে আর মাগির বাইরে বেরুবার দরকার হবেনি; কেউ বললে, তাই

কি ?—মাগির বয়েস হয়ে এসচে, চোখ বুজলে তবু পাড়াটা ঠাণ্ডা হবার আশা ছেল, এখন এই বউ ঐ শাশুড়ির হাতে টেনিং পেয়ে যা দাঁড়াবে তাতে সে আশায় চিরকালের জন্মে আকা'র ছাই পড়ল।

"সবচেয়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম মেরে গেল রাঙাখুড়ি। অবিশ্যি পেরথোম শ্বশুরবাড়ি এসে বউ যে দুপাঁচ দিন ছেল, ত্যাখন আর মুখ খোলেনি, তারপর ঘর করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আশ মিটিয়ে নেগে গেল বছরখানেক উপোসী রয়েচে, বুঝতে পারলেননি কথাটা ? বোয়ের কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই,—একগলা ঘোমটা টেনে, কাজ নিয়ে বাড়িময় ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্চে—একটা মনিষ্যি যে উদয়াস্ত ব'কে মরচে—তোকেই ঘা দিয়ে—কিছু একটা কর্, একটু চোখের জল ফেল্, না হয় গিয়ে খানিকটা শুয়ে থাক্, না হয় খাওয়া বন্ধ কর্; ওদিকে না যাস্ উত্তুরই দে মুখ তুলে দুটো ! কিছু না, কে কাকে যেন বলচে ! আগেকার বৌটা অত ভালোমানুষ ছেল, আর অত ক্ষীণজীবী, সে পজ্জন্ত মাঝে মাঝে দু'একটা কথা ঘুরিয়ে বলত, এ যেন ঠোঁট দুটো সেলাই করে বসে আচে। মাগি যেতে নাগল আরও ক্ষেপে, বাড়িতে কাক চিল বসা বন্ধ হল; উঁহুঁঃ, কার বয়েটি গেচে কথা কইতে ! রাঙাখুড়ি যেন সমিস্তেয় পড়ে গেল। উদিকে বোয়ের সুখ্যেতি হুহু ক'রে বেড়ে চলেচে পাড়ায়, কি যে করবে মাগি যেন ভেবে উঠতে পারলেনি। সমিস্তের ওপর সমিস্তে, এই সময় মাগি হঠাৎ অসুখে পড়ে গেল। দিব্যি ভোগের শরীল, মাথাব্যথাটা পজ্জন্ত কখনও হয় না, হঠাৎ একি কাণ্ড ! খুড়ির মুখ শুকিয়ে গেল, ডাইনি নয়তো বউ ? মুখে কথা নেই, এদিকে ভেতরে ভেতরে কিছু তুকতাক করে দিলেনি তো ? হঠাৎ বকুনি-ঝকুনি সব বন্ধ করে দিলে। পাড়াও ইদিকে ঠাণ্ডা হোল !

"অসুখ কিন্তু বেড়ে যেতেই লাগল দাদাঠাকুর। কথাটা বুঝলেননি ? একে ভয় পেয়ে গেচে ভেতরে ভেতরে, তায় কোঁদলের নাড়িগুনো বেশ হাতপা ছড়িয়ে খেলতে পারচেনি, সব ধকলটা ত যেয়ে পড়চে নিজের

দেহের ওপর, অসুখ না বেড়ে যেয়ে উপায় কি? একটি মাস গেল, বাঁচবেইনি বলে সবাই জানে,—এমন সময় আবার ড্যাংডেঙিয়ে সেরে উঠল। কথা খুব সোজা,—এই শেষ হ্যাপা, এই রকম আশা ক'রে ছেলে প্রাণপণে সেবা করেচে, সোয়ামীও এই শেষ চিকিচ্ছে আশা ক'রে কিছুর আর কসুর করেনি, ফল হোল উল্ট, মাগি ড্যাংডেঙিয়ে বেঁচে উঠল। পাড়ার সবাইয়ের মুখ আবার শুকিয়ে উঠল।

"শুদু বেঁচে ওঠা নয় দাদাঠাকুর, দেহ-মনের একেবারে নবকলেবর নিয়ে বেঁচে উঠল। কথাটা হচ্চে, ডাইনি বউ ব'লে যে একটা ভয় সেঁদে গেছল সেটা একেবারে কেটে গেল কিনা, মনটা দিব্যি ঝরঝরে হ'য়ে উঠল। অবিশ্যি খুব দুব্বল হয়ে গেল, মাসখানেকের ভোগান্তি তো! কিন্তু বাঁশের কোঁড়ার মতন সাঁ-সাঁ ক'রে আবার পুরন্ত হয়ে উঠতে লাগল। বেশ মনে আচে— ডাক্তারে পত্যি দিলে শুকুরবার দিন; শনি নয়, রবি নয়, সোম নয়, মঙ্গল নয়, বুধবার দিন দুপুরে রাঙাখুড়ি আবার গলা খুলে দিলে। অবিশ্যি জোর আর ত্যাতটা কোত্থেকে থাকবে—পোরের ভাত চলচে ত্যাখনও, তবে ছাঁদ ঠিক আগেকার মতন। বামুনের কাচে লুকুব না,—কাঁচিয়ে যেতে পারে আশা করে খোঁজ নিতে গেছলাম দাদাঠাকুর, আর কষ্ট করে মুখের কথা খরচ করতে হোলনি, ঘাড়টি হেঁট করে আস্তে আস্তে ফিরে এলুম।

"তারপর আজ একরকম তো কাল একরকম। এবার সব ঝোঁকটা যেয়ে পড়ল বোয়ের ওপর। তার দুটো হেতু ছেল, পেরথোম তো বাইরে বেরুতে পারে না, ঐ এক বউই ভরসা, তার ওপর বউ যে ডাইনি নয় সেটা পাকা হয়ে যেতে সাহস গেল বেড়ে, সাহস বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশটাও, উঠতে বসতে দাঁতে পিষতে লাগল। জিগ্যেস করবেন বোয়ের ভাবটা কি? না, একটি কথা নয়, সেই আগেকার মতন ঢ্যাং ঢ্যাং করে মুখ বুজে নিজের পাট সেরে যাওয়া, না রাম, না গঙ্গা, কিচ্ছু নয়। তবে কি জানেন দাদাঠাকুর —মানুষেরই মন তো?—ঐ যে চাঙ্গা হয়ে উঠল মাগি, তাতে নেগেছিল

প্রাণে। একে শরীলে অসুরের মতন শক্তি থাকতেও কনেবউ বলে কিছু বলতে পারচেনি, তায় মাগির দাপটটা আরও গেচে বেড়ে, একটু অধৈয্য না হয়ে পড়লে এমনটা আর হোল কেন ?

"বারটা বেশ মনে আচে, শনিবার। জীবনকাকার মায়ের শেরাদ্দ ছেলো, আমরা সবাই জুটেচি। দুপুব গইড়ে গেচে। দুটো বাড়ি বাদ দিয়েই বিলাসের বাড়িটা, সেখেনে রাঙাখুড়ি একাই এমন আসর জমিয়ে ফেলেচে যে, কাজের বাড়ির হট্টগোলও ফিকে মেরে গেচে।···সেই বউকে নিয়ে—'আমি কবে ঘটা করে শেরাদ্দের নেমন্তন্ন খাওয়াব সবাইকে রে!···কবে এই পোড়াকপালীর হাত·থেকে নিস্কিতি পাব রে!···কবে আবার ঘটা করে লতুন বউ ঘরে নে'স্‌বো রে! ও ডাইনি আমায় গুণ ক'রে মেরে ফেলতে বসেছেল, আবার কি মন্তর ঝেড়ে কি অপঘাত ঘটাবে রে!'···মাঝে মাঝে কানে যাচ্চে, মাঝে মাঝে আবার ইদিককার গোলমালে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্চি সবাই, এমন সময় 'বাপরে—গেনু!' ব'লে এক পাড়াফাটানো চীৎকার, আর তারপরেই সব ঠাণ্ডা একেবারে। সবাই বাক্‌রুদ্ধ হয়ে এ-ওর মুখের পানে চেয়ে রইনু, তারপর উরই মধ্যে কে একজন বলে উঠল—'বউটাকে বোধহয় সাবাড় করে দিলে—এ গলা তো মাগির ছেল না!'

"এদানি নাকি মারধোরও শুরু করেছেল—উঠতে পারতনি—ঘটিটা, বাটিটা, জাঁতিটা, শিশিটা যা হাতের কাছে পেলে তাই মারলে ছুঁড়ে—পিটে নাগল, কি কপালে নাগল, কি হেঁটুতে, তোয়াক্কা নেই। কথাটা শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে উঠতে যাব, মিনিটখানেকও হয়নি দাদাঠাকুর, এমন সময় পাশের বাড়ির গোবদ্ধন বাউরির ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—'শীগ্‌গির করে এসো, রাঙাদিদিকে সাপে খেয়েচে!'···'সাপে খেয়েচে কি রে!···কাকে?' বলে সবাই দুদ্দুড়িয়ে ছুটলুম, গিয়ে দেখি একবন্নও মিথ্যে নয়, মাগি শুয়ে একটা গোঁ-গোঁ ক'রে শব্দ করতে করতে বালিসে আস্তে আস্তে মাথা চালাচ্চে। ইদিকে ঠিক কব্জির নিচেটায় এতখানি একটা

ছোবলের দাগ, কালো রক্তে বিছানার এতখানিটা গেচে ভিজে, ত্যাখনো ঝরচে রক্ত একটু একটু ক'রে।

"ছোবল দেখে সবার চক্ষুস্থির। সাপ যে হেঁজিপেঁজি সাপ নয়, এটা বুঝতে কারুর বাকি রৈলনি। ত্যাখুনি মাগির হাতে গোটা তিনেক শক্ত বাঁধন দেওয়া হোল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক ছুটল দাসু হাজরার ওখানে। দাসু হাজরার বাড়ি মসনের পাশেই রূপুলিতে; এ-তল্লাটে ত্যাখন তার মতন রোজা নেই। ইদিকে কটা ছোঁড়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল বিলাস আর তার বাপকে ডেকে আনতে, বাড়িতে বড একটা থাকতনি কিনা ওরা, এদানি আবার আরও কম থাকত।"

স্বরূপ আবার কলিকাটা চাহিয়া লইয়া গোটাকতক দীর্ঘ টান দিল, তাহার পর সেটা হুঁকার মাথায় পুনরায় বসাইয়া দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল —"কি কথা থেকে যে উঠল কথাটা ? হ্যাঁ, আমায় বলে কিনা, তুমি নিজের চোখে মন্তরের খেলা দেখেচ ?···চ্যাংড়া ছোঁড়া দু'কলম ইঞ্জিরি প'ড়ে মনে করে···তবে একথা অবিশ্যি মানব দাদাঠাকুর, সিদিন যা দেখলুম তার তুল্যি পূব্বে দেখিওনি, আর এ জম্মে দেখতেও হবেনি।

"দাশরথি ছেল না ঘরে, ভিন্ গাঁয়ে কোথায় গেছল, তার ছেলে নিবারণ এসে রুগী ধরলে। পিঠে থালা বসিয়ে মন্তর ব'লে ইঁদুরের মাটি ছুঁড়ে মারে, থালা বসে না। অথচ রুগী ইদিকে নেতিয়ে পড়চে, গ্যাঁঙানি গেচে বেড়ে। নতুন শিখচে বাপের কাছে, ভেবড়ে গেল। এর মধ্যে এরা বাপ-বেটাতেও এসে পড়েচে, বিলাস আবার ছুটে যাবে রূপুলিতে, এমন সময় বুড়ো দাশরথি স্বয়ং এসে হাজির, কানে গেলে যেখেনেই থাক্ ছুটে এসতে হবে কিনা। ঢুকেই বললে—কৈ আমার বিজিট কোথায় ?···দাসু হাজরার কাচে লোক পাট্যেই ভালো করে গ্যাঁজার ব্যবস্থা করে রাখতে হোত, বিলাসের বাপ কলকেটি হাতে তুলে দিলে। বেশ নিশ্চিন্দি হয়ে দম চড়িয়ে নিয়ে আর অন্ত কিছু না ক'রে একেবারেই কড়ি চালা।

"কড়ি তো চালবে, কিন্তু কড়ি চলে কৈ দাদাঠাকুর? মন্তর আউড়ে হাতের মধ্যে কড়ি নেড়ে দেয় ছেড়ে, সীসের ভাঁটার মতন মাটি কামড়ে যে পড়ে—আর নড়ন-চড়ন নেই। একবার, দুবার, তিনবার হেরে দাশরথি-বুড়োর মুখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে উঠে সবার ওপর একবার দিষ্টি বুলিয়ে গর্জে উঠল—'কি, দাশু হাজরার সঙ্গে তঞ্চকতা! সাপ মেরে ফেলে আমায় দিয়ে কড়ি চালানো! তামাসা! তামাসা আমি দেখিয়ে দিতে পারি এক্ষুনি—জানে না সব, চেনে না দেশো হাজরাকে?'…মন্তর-তন্তরে ভয়ানক পারদস্তি, রাগের মাথায় কি করে বসবে। বিলাসের বাবা, আরও কয়েক জন হাত জোড় করে বললে—'দোহাই সদ্দার, কেউ সাপকে আমরা চক্ষেই দেখিনি, মারা তো দূরের কথা। ছোবলের বহর দেখে সাপকে খোঁজবার হেম্মৎও হয়নি আমাদের কারুর।' অনেক করে কাকুতি মিনুতি করে বলতে, বুড়ো ঠাণ্ডা হোল, বললে—'আর এক ছিলিম বড় তামাক।'

"বেশ ভালো করে গ্যাঁজা টেনে, সমস্ত উঠোনটা ঘুরে ঘুরে কি সব তুক তাক করে এসে আবার কড়ি নিয়ে বসল; চোখ দুটো জ্বলচে, সমস্ত শরীল দিয়ে মন্তর যেন ফুটে বেরুচ্চে; বিড়-বিড় করে মন্তর ব'লে, হাতের কড়ি উঠোনে আছড়ে' হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'চল্!'…কড়ি এবার চলল, কিন্তু বিগোৎ খানেক গিয়ে আবার গেল থেমে। দাশু হাজরা একেবারে উঠে দাঁড়ালো, আর একটা পাড়াফাটানো হুঙ্কার দিয়ে কড়ির ওপর ইঁদুর মাটি আছড়ে' মন্তর আউড়ে বললে—'চল্! সাপ হোক, দেবদানো-যক্ষী যেই হোক, হাজির কর্ সামনে!'…সঙ্গে সঙ্গে কড়ি একেবারে জীয়ন্ত হয়ে উঠল দাদাঠাকুর, সে কি চাল! বার দুয়েক একটু ডাঁইনে-বাঁয়ে করলে, যেন ঠাহর করতে পারচে না, তারপর ধরলে সোজা রাস্তা, যেন চোর ধরে আনতে পেয়াদা চলেচে। দাওয়ার গা বেয়ে উঠোনে নামল, উঠোন পেইরে গোয়ালে ঢুকল, তারপরেই সে যা দিশ্য দাদাঠাকুর!—কপালের মাঝখানে কড়িটা চেপে

বসেচে, চোখ দু'টো রাগে জ্বলচে যেন আগুনের ভাঁটা, মাথাটা সিদে করে ধরেচে ঠিক যেন ফণা-ধরা একটা খরিস গোখরো⋯গোয়ালের মধ্যে থেকে হেলতে দুলতে গনগনিয়ে বেইরে এসচে....।"

তদ্গত হইয়া শুনিতেছিলাম, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"যেন ফণা-ধরা কি বলচ স্বরূপ, সাপ নয় ?"

স্বরূপও কম বিস্ময়ে আমার পানে চাহিল না, একটু সেই ভাবে থাকিয়া উত্তর করিল—"আপনি যে অবাক করলেন দাদাঠাকুর, সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার ভাষ্যে ! ঐরকম গলাবাজির মধ্যে সাপ কোথায় পাবে !—মসনের ও-তল্লাটের মধ্যে কেউ কখনও সাপ দেখেনি ; ভিটের সাপ বনে পালায়, বনের সাপ পাঁদাড়ে পালায়—রাঙা-খুড়ির এমনি দাপট।⋯দাদাঠাকুর আবার জিগ্যেস করে—সাপ নয় নাকি স্বরূপ ?—সাপ কোথা থেকে এসবে ? সাপ এত সস্তা নাকি ?

"বউটো মন্তরের টানে হন হন করে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালে, ঠিক যেন কার ভয় হয়েচে⋯।"

"কার বউ স্বরূপ !"

"নেও ! কার বউ এখন তাই বুঝিয়ে বলো দাদাঠাকুরকে !...ঐ বিলাসের বউ ; নিজের ছেলের বউ যার বাড়িতে টেঁকতে নারে, অপর কার বউ এসবে তার বাড়িতে ? অত নজ্জা তো ? শাশুড়ির সামনেও অষ্টপহর ঘোমটা, এক বাড়ি নোকের সামনে সিদে দাঁড়িয়ে বললে—"কামড়াব নি ? এগুনে জামবাটিটা ছুঁড়ে⋯!"

প্রশ্ন করিলাম—"বউই কামড়ালে ?"

"না কামড়ে' কি করে ক'ন দাদাঠাকুর ? বললে কিনা—রাগের মাথায় পয়লা একটা জামবাটি ছুঁড়ে মারলে মাগি, সেটা ব্যথ্য হতে সেই দুব্বল শরীলে বিছানা ছেড়ে নাপ্যে উঠে ধরলে কষে চুলের মুটি ! ব্যস, সেই ছাঁদনাতলা থেকে শুরু করে আজ পজ্জন্ত য্যাত রাগ ছেল জমে, সব একট্টা

করে কব্জির নিচে এক রাম-কামড় ! দুব্বল শরীল, তায় আচমকা তেড়ে নাপ্যে উঠেচে, তার ওপর ফিনিক-দেওয়া রক্ত দেখে মাগি তো ভিরমি গিয়ে পড়ল দাঁতকপাটি নেগে ; জ্ঞান হবে কি, ঐ অবস্থার ওপর আরও তিনটে উৎকট বাঁধন—তেমনি নাকি দজ্জাল তাই নাড়ী ছেড়ে যায়নি।...দেখি একবার, পেসাদের যদি থাকে একটু।

"একপাতা এ-বি-সি-ডি প'ড়ে আমায় বলে কিনা মন্তর মন্তর করচ, মন্তরের খেলা তুমি দেখেচ নিজের চোখে ?....নাঃ, কৈ দেখিনি তো ? কোত্থেকে আর দেখব ?"

— শেষ —

